বাংলাদেশে থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম বিকাশে শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবিরের অবদান

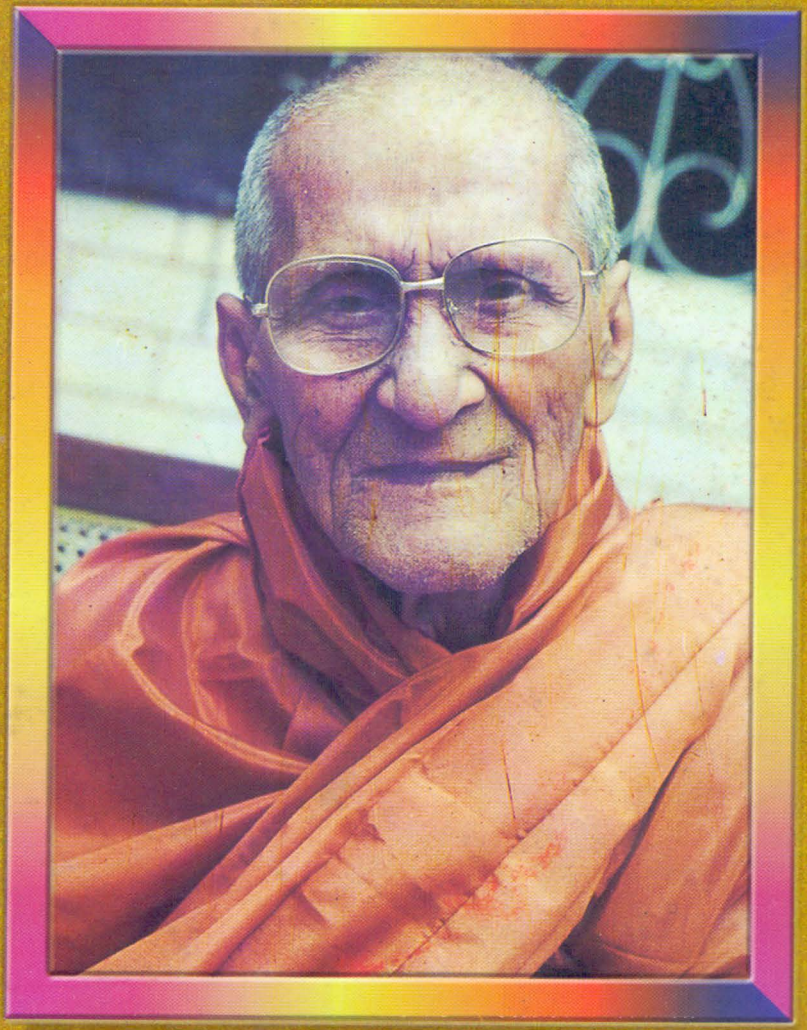

ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া

এম বি বি এস; এফ সি পি এস

প্রাক্তন আবাসিক সার্জন

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Agrakirti Bhante

বাংলাদেশে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম বিকাশে শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবিরের অবদান

ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া
এম বি বি এস, এফ সি পি এস
প্রাক্তন আবাসিক সার্জন
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

বাংলাদেশে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম বিকাশে শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবিরের অবদান

প্রকাশ কাল
১৯ জানুয়ারী ২০০১ ইংরেজী
৬ই মাঘ ১৪০৭ বাংলা

প্রকাশনায়
শীলালংকার মহাথেরো'র জাতীয়
অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া উদ্‌যাপনী পরিষদ

কম্পিউটার কম্পোজ
রাজবন কম্পিউটার
১২, জি. এ. ভবন (২য় তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণে
ওসাকা আর্ট প্রেস
মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

মূল্য ঃ ৫০ টাকা মাত্র।

বাংলাদেশে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম বিকাশে শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবিরের অবদান

প্রকাশ কাল
১৯ জানুয়ারী ২০০১ ইংরেজী
৬ই মাঘ ১৪০৭ বাংলা

প্রকাশনায়
শীলালংকার মহাথেরো'র জাতীয়
অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া উদ্‌যাপনী পরিষদ

কম্পিউটার কম্পোজ
রাজবন কম্পিউটার
১২, জি. এ. ভবন (২য় তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মুদ্রণে
ওসাকা আর্ট প্রেস
মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

মূল্য ঃ ৫০ টাকা মাত্র।

বুদ্ধের মূল ধর্ম বা থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম

খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে মহাকারুণিক গৌতমবুদ্ধ ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে (আর্যবর্তে) চার অসংখেয় কালসহ লক্ষাধিক কল্প অবিরাম সাধনায় বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুম মূলে সম্বোধি লাভ করে তাহা বিশ্বের সত্ত্বকূলের হিতার্থে সম্প্রচার করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধ জগতে মানব হিসাবে আবির্ভূত হয়ে শুধু মানবের জন্য নহে, সকল সত্ত্বের হিতকামী বলে মহামানব ও অতিমানব হিসাবে বিশ্ববাসীর নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করে ছিলেন। বুদ্ধ ও বুদ্ধের সম্প্রচারিত ধর্ম সম্বন্ধে এইরূপ কল্যাণ কীর্তিশব্দ, অভ্যুত্থিত হয়েছে যে– তিনি ভগবান অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্, অনুত্তর দম্যপুরুষ সারথী, দেব মনুষ্যগণে শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান; তিনি দেবলোক, মারলোক, ব্রহ্মলোক এবং দেবমনুষ্য এইসব লোক স্বয়ং অভিজ্ঞার দ্বারা সাক্ষাৎ করে উহার স্বরূপ প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মোপদেশ প্রদান করেন, যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ ও অন্তে কল্যাণ। তিনি অর্থ যুক্ত, ব্যঞ্জনযুক্ত সমগ্র পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশিত করেন। এই সর্বজ্ঞাসম্বন্বিত মহাপুরুষের ধর্ম ভারতের মধ্যপ্রদেশের অধিবাসীদের সহজলভ্য ও সহজবোধ্য করার অভিপ্রায়ে বুদ্ধ এই ধর্মলোকপ্রচলিত মৌখিক ভাষায় প্রচারিত করেছিলেন। তৎকালীন বুদ্ধের ধর্মের প্রচারিত ভাষা ছিল মগধীভাষা, এই মগধীভাষাই পরবর্তীকালে পালি ভাষা নামে অভিহিত হয়। ভগবান বুদ্ধ মগধীভাষার মধ্যপ্রদেশে বুদ্ধত্ব লাভের পর ৪৫ বৎসর ব্যাপী বুদ্ধের নিজস্ব প্রকাশ ভঙ্গীতে তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর এইরূপ প্রকাশভঙ্গীর জন্য বৌদ্ধধর্মকে নবাঙ্গ শাস্তা শাসন। (নবাঙ্গ সত্থুসাসন) বলা হয়।

প্রথমে বৌদ্ধধর্মকে সংগীতিকারকরা ৮৪ হাজার স্কন্ধে সংকলন করে শুধু ধর্মবিনয় নামে অভিহিত করেছিলেন। তৃতীয় সংগীতিতে বৌদ্ধ ধর্মের সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম– এই তিন প্রধান বিষয় এক এক পিটকে বা ঝুঁড়িতে সংকলিত করে মগধী ভাষায় "ত্রিপিটক" নামকরণ করা হয়।

বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্যগণ ছিলেন ধর্মধর, বিনয়ধর, শ্রুতিধর এবং সংস্কারমুক্ত। তাঁরা বুদ্ধের নিকট যাহা শ্রবণ করতেন, তাহা আজীবন অবিকল স্মরণ রাখতে পারতেন। তাই বুদ্ধের জীবিত কালে বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত বাণী তাঁর শিষ্যগণ শ্রদ্ধাচিত্তে অনুশীলন এবং অনুসরণ করতেন। বুদ্ধ দীর্ঘনিকায় গ্রন্থে পাসাদিক সূত্রে বলেছিলেন– "চুন্দ, যখন ধর্মবিনয় ব্যাখ্যান অপটু হয়, উহার প্রচার অফলপ্রদ হয়, লক্ষ্যে চালিত করবে না এবং শান্তি প্রদানে উহা অসমর্থ হয়। উহা সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হয়না, তখন এইরূপই হয়" নিগন্ঠ নাথপুত্রের মৃত্যুর পর তাদের ধর্মের এই অবস্থা হয়েছিল। বুদ্ধের পরিনির্বানের পর বুদ্ধের ধর্ম অপটু ও অনভিজ্ঞ ভিক্ষুদের দ্বারা ধর্মের ব্যাখ্যান এবং অর্থ বিকৃত হয়ে নিগন্ঠ নাথপুত্রের ধর্মের পর্যায়ে পর্যবেশিত হতে পারে এই চিন্তা করে মহা প্রভাবশালী মহাকশ্যপ বুদ্ধের বাণী সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত করে প্রথম সংগীতির আয়োজন করেছিলেন। মহাকশ্যপের দূরদর্শিতার ফলে সম্যক সম্বুদ্ধের প্রচারিত বুদ্ধবাণী থেরবাদী বৌদ্ধদের নিকট এখন ও স্বমহিমায় জগতে বিদ্যমান আছে। তবে দ্বিতীয় সংগীতিতে বৌদ্ধ ধর্মর বিনয়ের বিশুদ্ধিতা সংরক্ষিত হয়েছিল এবং তৃতীয় সংগীতিতে অভিধর্মের পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। তৃতীয় সংগীতির পর সংগীতিকারকগণ তিনটা পিটকে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত বুদ্ধবাণীর ভানক, অক্ষর এবং শ্লোক নির্ধারিত করেছিলেন।

বিনয় পিটক ঃ

১। **সুত্তবিভঙ্গ ঃ** প্রাতিমোক্ষ সূত্রের প্রাচীন অর্থকথা দুই খন্ডে বিভক্ত। যথা ঃ

(১) পারাজিকা

(২) পাচিত্তিয়।

২। **খন্দক ঃ** ২ ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ

(৩) মহাবর্গ

(৪) চুল্ল বর্গ

৩। **পরিবার বা পরিবার পাঠ।**

বিনয় পিটকে সর্বমোট ১৬৯ ভানবার আছে এবং ১,৩৫২,০০০ অক্ষর আছে অথবা ৪২,২৫০ গ্রন্থি আছে।

বিনয়পিটকের অর্থকথার গ্রন্থাবলী- সামন্ত পাসাদিকা, বজির বুদ্ধিটিকা, সারত্থ দীপনী, বিমতি বিনোদিনী কংখা বিতরণী প্রভৃতি।

সূত্রপিটক ঃ

১। **দীর্ঘনিকায় ঃ** ৩টা বর্গ ৩৪ সূত্র এবং ২৫ অযুত অক্ষর আছে। দীর্ঘ ভানক বলা হয়। অর্থকথা সুমঙ্গল বিলাসিনী বলা হয়।

২। **মধ্যম নিকায় ঃ** ৩টা বর্গ, ১৫২ সূত্র এবং ১৫ বর্গ এবং ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার অক্ষর আছে। মধ্যম ভানক বলা হয়। অর্থকথা পপঞ্চসূদনী।

৩। **সংযুক্ত নিকায় ঃ** ৫টা বর্গ, ৭৭৬২ টা সূত্ত এবং আটলক্ষ অক্ষর আছে। অর্থকথা- সারথপ্পকামিনী।

৪। **অঙ্গুত্তর নিকায় ঃ** ১১টি নিপাত, ৯৫৫৭ সূত্র এবং ৯ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার চারশত অক্ষর আছে। অর্থকথা ঃ মনোরথপুরনী।

৫। **খুদ্দক নিকায় ঃ** ১৫টি গ্রন্থ আছে।

১। খুদ্দক পাঠ- অর্থকথা ঃ পরমত্থজ্যোতিকা

২। ধর্মপদ- অর্থকথা- ধর্মপদ অট্ঠকথা ২৬টি বর্গ এবং ৪২৩ গাথা আছে।

৩। উদান - অর্থকথা পরমত্থ দীপনী ৮ টা বর্গ এবং ১০টা উদান।

৪। ইতিবুত্তক – অর্থকথা পরমত্থদীপনী ১২২ টা সূত্র আছে। ৪টা নিপাতে প্রত্যেকটাতে ১০টা করে সূত্র আছে।

৫। সূত্রনিপাত- অর্থকথা -পরমত্থ জ্যোতিকা, ৫টা বর্গে ৭০টা সূত্র আছে।

৬। বিমান বত্থু-অর্থকথা- পরমত্থ দীপনী ৭টা বর্গে- ৮৫ বিমান কাহিনী, এবং ১২৮২ গাথা আছে।

৭। প্রেতবত্থু অর্থকথা- পরমমত্থ দীপনী ৪টা বর্গে ৫১টা প্রেতকাহিনী এবং ৮১৪গাথা আছে।

৮। থেরগাথা- অর্থকথা পরমত্থ দীপনী ১ হতে ২১ নিপাতে বিভক্ত।

২৬৪ জন স্থবিরের কথা উল্লেখ আছে।

৯। থেরীগাথা ঃ অর্থকথা পরমত্থদীপনী ৭৩ জন থেরীর ৪৯৮টি গাথা আছে।

১০। জাতক ঃ অর্থকথা জাতক অর্থকথা বর্ণনা। এক হতে ১৩টি নিপাতে বিভক্ত।

৫৪৭টা জাতক কাহিনীর উল্লেখ আছে।

১১। নিদ্দেশ- অর্থকথা সদ্ধর্মপজ্যোতিকা দুই খন্ডে বিভক্ত–

(১) মহা নিদ্দেস সুত্র নিপাতের অট্ঠ কবর্গের অর্থকথা।

(২) চুল্লা নিদ্দেস- সূত্র নিপাতের পারায়ন বর্গ ও খগ্গটিসান সূত্রের অর্থকথা।

সারিপুত্র স্থবির কর্তৃক রচিত।

১২। পটিসম্ভিদামগ্গ- অর্থকথা সধম্মপকাসিনী। এখানে ৭৩ প্রকার জ্ঞানের কথা আছে।

১৩। অপদান - অর্থকথা বিসুদ্ধ জনবিলাসিনী, চারভাগে বিভক্ত– যথা

(১) বুদ্ধ অপদান-বুদ্ধগুণ এবং ক্ষেত্র বর্ণনা

(২) প্রত্যেক বুদ্ধ অপদান- স্থবির আনন্দের প্রশ্নোত্তরে প্রত্যেক বুদ্ধের বর্ণনা।

(৩) থের অপদান - ভিক্ষুগণ কর্তৃক ১০ অপদানে ৫৫ বর্গ

(৪) থেরী অপদান ভিক্ষুনীগণ কর্তৃক ১০ অপদানে ৪ বর্গ।

১৪। বুদ্ধ বংশ- অর্থকথা মধুরত্থবিলাসিনী ২৪ জন সম্যক সম্বুদ্ধের জীবনী এবং গৌতমবুদ্ধের সহিত তাঁদের সম্পর্ক।

১৫। চরিয়া পিটক- অর্থকথা পরমত্থ দীপণী। ভদ্রকল্পে বোধিসত্ত্বের পারমীপূরণের তিন পরিচ্ছেদে ৩৫টি কাহিনী।

অভিধর্ম পিটক- ৭টা খন্ড

১। ধর্ম সঙ্গনী- ১৩টা ভানবার অর্থকথা– অত্থসালিনী

২। বিভঙ্গ- ৩৫ ভানবার, অর্থকথা সম্মোহবিনোদিনী।

৩। ধাতুকথা- ৬ ভানবার অর্থকথা পঞ্চপ্পনকরণত্থকথা।

৪। পুগ্গলপঞ্ঞত্তি- ৫ ভানবার পঞ্চপ্পণকরণত্থকথা।

৫। কথাবত্থু- ৬৪ ভানবার পঞ্চপ্পণকরণত্থকথা।

৬। যমক- ২০০০ ভানবার পঞ্চপ্পণকরণত্থকথা।

৭। পট্ঠান- অসংখ্য ভানবার পঞ্চপ্পণকরণত্থকথা।

থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্মে ত্রিপিটক বহির্ভুত পালিভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে। এই গ্রন্থাবলী থেরবাদ বৌদ্ধদের দ্বারা থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্মের মূল আদর্শে রচিত হওয়াতে বৌদ্ধ ধর্মের একটা সুদৃঢ় ভিত্ প্রতিষ্ঠিত

হয়েছে। তাই এই সব বই সম্বন্ধে ধারণা থাকলে থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া যায়।

১। **ত্রিপিটক বহির্ভূত পালি গ্রন্থাবলী**
(১) সূত্র সংগ্রহ
(২) নেতিপ্রকরণ
(৩) পেটকোপ দেশ
(৪) মিলিন্দ প্রশ্ন
(৫) বিমুক্তি মার্গ
(৬) বিশুদ্ধিমার্গ

২। **বংশ গ্রন্থাবলী**
(১) দীপবংশ
(২) মহাবংশ
(৩) বংসমালি বিলাসিনী
(৪) মহাবোধিবংশ
(৫) থুপবংস
(৬) দাঠা বংশ
(৭) নলাট ধাতু বংশ
(৮) ছকেসধাতু বংস
(৯) হত্থবন পল্লবিহার বংস
(১০) সমন্তকূট বন্নুনা
(১১) সংগীতিবংশ
(১২) অনাগত বংশ
(১৩) দসবোধিসম্বুদ্দেশ
(১৪) দস বোধিসত্তুপত্তিকথা

৩। **পদ্যাকারে রচিত গ্রন্থাবলী** -
(১) পজ্জমধু
(২) তেলকঠাহ গাথা
(৩) জিনচরিত
(৪) জিনলংকার
(৫) সাধু চরিতোদয়
(৬) জিনবোধিবলী

৪। **উপখ্যানমূলক রচনা**
(১) দসবত্থুপ্পকরণ
(২) সহস্সবত্থুপ্পকরণ
(৩) রস বাহিনী
(৪) সিহল বত্থুপ্পকরণ

৫। **সংকলিত গ্রন্থাবলী**
(১) সারসংগ্রহ
(২) উপাসক জালংকার
(৩) মঙ্গলত্থ দীপনী
(৪) জিনমহানিদান

৬। **জগত সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী** -
(১) পঞ্চগতিদীপনী
(২) ছগতি দীপনী
(৩) লোক পঞ্ঞত্তি
(৪) লোক দীপকসার
(৫) চক্রবাল দীপনী
(৬) চন্দসূরিয় দীপনী

৭। **দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রচিত পালি গ্রন্থাবলী ঃ**
(১) লোকনীতি- ব্রহ্মদেশ
(২) লোকনেয়্যপ্পকরণ - ব্রহ্মদেশ
(৩) মনুস্স বিনেয়- ব্রহ্মদেশ
(৪) চামদেবী বংশ - থাইল্যাণ্ড
(৫) জিনকাল মালীপ্পকরণ- থাইল্যান্ড
(৬) পঞ্চবুদ্ধব্যাকরণ- থাইল্যাণ্ড।

প্রাথমিক পর্যায়ে বৌদ্ধ ধর্মে বিভিন্ন নিকায় বা দলের উৎপত্তির বিবরণ

ভগবান বুদ্ধ সম্বোধি প্রাপ্তির পর নিভৃতে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় তাঁর মনে এই বিতর্কের উৎপত্তি হয়েছিল– আমি গম্ভীর দুর্দশ, দূর নুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ, পণ্ডিতবেদনীয় ধর্ম অধিগত করেছি। জনসাধরণ আলয়ারাম, আলয়রত, আলয়সম্মোহিত, তাদের পক্ষে ইদ্প্রত্যয়তা, প্রতীত্যসমুৎপাদ এই তত্ত্বদর্শন করা দুষ্কর, তাদের পক্ষে সর্ব সংস্কার শমথ, সর্ব-উপাধি মুক্ত, তৃষ্ণাক্ষয়, রাগবিহীনতা- এই তত্ত্বস্থান দর্শন করা আরও দুষ্কর। যদি আমি ধর্মোপদেশ করি এবং অপরে তাহা বুঝতে না পারে, তাহা হলে তাহা আমার পক্ষে ক্লেশ ও বিরক্তির কারণ হবে।" এই বিতর্কের পর সহপতি ব্রহ্মার একান্ত অনুরোধে ভগবান বুদ্ধ পরম করুণাবশে দেবমনুষ্যের কল্যাণার্থে তাঁর কষ্টে অধিগত ধর্ম প্রচারের জন্য মনোনিবেশ করেছিলেন। বুদ্ধের ধর্ম প্রবর্তনের সাথে সাথেই তৎকালীন ভারতীয় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ বুদ্ধ ধর্ম-

"স্বাক্খাতো ভগবতো ধম্মা সন্দিট্ঠিকো, অকালিকো, এহিপস্সিকো, ওপনায়িকো, পচ্চত্তং বেদিতব্বে বিঞ্ঞূহীতি।" অর্থাৎ ভগবান কর্তৃক প্রচারিত ধর্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনীয়, ফল প্রদান কালাকাল বিরহিত, এস দেখ, উপনায়িক, বিজ্ঞগনকর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞাতব্য।" বুদ্ধের মত ক্ষাদ্রবীর্য সম্পন্ন সুপুরুষ ব্রহ্মচর্য জীবন পরিশীলিত ব্যক্তিত্ব উপরিউক্ত ছয়গুণ সম্পন্ন ধর্ম প্রচারের দ্বারা দেবমানুষে ইহকাল ও পরকালের অনন্ত সুখপ্রদানের বিষয় ব্যক্ত করা হলে জনসাধারণ স্বভাবতঃ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। তাই জনসাধারণ সত্যিকার মুক্তির পথ প্রত্যক্ষ করে বুদ্ধের অনুগামী হতে থাকে। তাহা ছাড়া এই ধর্মে অন্যান্য ধর্মের মত ভোগবিলাসের উৎস কামসুখোদ্রেকের প্রতি আনুরক্তি নেই এবং অতিরিক্ত কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা শারীরিক নির্যাতনের কথা ও নেই। এই দুই অন্তের মধ্যবর্তী হয়ে ব্রহ্মচর্য জীবনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে মুক্তি পথ প্রত্যক্ষ করা যায়। এই ধর্ম মধ্যম প্রতিপদা নামে অভিহিত করা হয়। এইজন্য বুদ্ধের ধর্ম প্রবর্তনকালে অনেকে ভারতীয় ধর্ম বিপ্লব শুরু হয়েছিল বলে থাকেন। এই সময় আজীবন সুবিধাভোগী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ বুদ্ধকে মায়াবী বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। কিন্তু সর্বগুণ সম্পন্ন বুদ্ধের ব্যক্তিত্বের নিকট তাদের সহিত তুলনাই হয় না। বুদ্ধের জীবিতকালে তারা বুদ্ধের ধর্ম সম্বন্ধে কোন দ্বিমত প্রকাশ করতে সাহস করে নাই। কিন্তু বুদ্ধের ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি বৌদ্ধ ভিক্ষু সঙ্ঘে প্রবেশ করাতে কিছু কিছু ব্যক্তি বৌদ্ধ ধর্ম বিনয়ে অনভিজ্ঞ এবং মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন ছিল। এই সব ব্যক্তিগণ বুদ্ধের মূল ধর্ম ব্যাখ্যায় অসমর্থ হয়ে নিজের মনগড়া ধর্মকে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে মনোযোগী হয়। এদের মধ্যে মহাদেব স্থবিরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কাশ্মীরে রচিত মহাবিভাষা শাস্ত্রে মহাদেবের জীবন বৃত্তান্ত উল্লেখ আছে। এই মহাদেব ছিলেন পিতৃহন্তা, মাতৃহন্তা এবং অরহৎহন্তা। বৌদ্ধ ধর্ম মতে পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা, অরহৎ হত্যা, সংঘভেদ এবং বুদ্ধ শরীর হতে রক্তাপাত করা – এই পঞ্চ গুরুকর্ম করলে এই জীবনে অরহৎ হওয়ার হেতু বিলোপ হয়। মহাদেব মথুরার একজন ব্রাহ্মণ ব্যবসায়ীর পুত্র ছিলেন। তিনি কুসুমপুরে (পাটলীপুত্রে) কুক্কুটারামে ভিক্ষু সংঘের নিকট ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আপন প্রচেষ্টা এবং অধ্যবসায় দ্বারা তিনি মথুরায় ভিক্ষুদের প্রধান হতে সমর্থ হয়েছিলেন। এমনকি তিনি তৎকালীন রাজাকে প্রভাবিত করে রাজার সহিত সখ্যতা অর্জন করেছিলেন। তখন মহাদেব তাঁর অরহৎ হওয়ার হেতু বিনষ্ট হয়েছে জানতে পারে অরহৎ সম্বন্ধে পাঁচটি মতবাদ প্রকার করেছিলেন। যথা–

(১) অত্থি অরহতো রাগোতি– অরহতের মধ্যে রাগ থাকতে পারে। (২) অত্থি অরহতো কংখাতি– অরহতের মধ্যে সংশয় থাকতে পারে। (৩) অত্থি অরহতো অঞ্ঞানতি– অরহতের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে অন্য ধারনা থাকতে পারে। (৪) অত্থি অরহতো পরবিতারনাতি। – অপরের সাহায্যেই অরহৎ হওয়া যায়। (৫) অহো উচ্চারণা তি– অরহত হওয়ার সময় "অহো" বলে উচ্চ শব্দ আরম্ভ করতে পারে অর্থাৎ কর্মস্থানে গভীর ধ্যান করতে "অহোদুঃখ' বলে অনুশোচনা করে অথবা "অহো সুখ" বলে উচ্চ শব্দ করে অরহত্ব প্রাপ্ত হয়। তিনি এই পঞ্চবস্তু বুদ্ধবচন বলে প্রচার করতেছিলেন। ইহাতে কিছু সংখ্যক ভিক্ষু মহাদেবের মতবাদ গ্রহণ করে তাকে সমর্থন করতেছিলেন। ফলে ভিক্ষুসঙ্ঘে বিভেদের সৃষ্টি হয়। এই বিভেদ মীমাংসায় ভিক্ষুসঙ্ঘ তৎকালীন রাজার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। রাজা বুদ্ধকে অনুসরণ করে ভোটের মাধ্যমে এই বিবাদ মীমাংসার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। মহাদেব তার মতবাদ ব্যাপক প্রচার করে এই মতবাদের জন্য ভোটে বিজয়ী হয়েছিলেন। এই সময়ে ভিক্ষুসঙ্ঘে বিভেদের ক্ষেত্র রচিত হয়েছিল। যারা ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন, তারা সংখ্যায় কম ছিলেন কিন্তু সকলেই ষড়ভিজ্ঞ ও অষ্ট সমাপত্তি প্রাপ্ত অরহৎ ছিলেন। এই ভিক্ষুগণ ঋদ্ধি প্রভাবে কাশ্মীরে চলে গেলেন। রাজা প্রকৃত ঘটনা অনুধাবন করতে পেরে এই ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রত্যাবর্তন করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু ভিক্ষুগণ পাটলীপুত্রে ফিরে আসেন নাই। রাজা কাশ্মীরে উক্ত ভিক্ষুদের জন্য ৫০০টা হবার নির্মাণ করে দান করেছিলেন। বসুমিত্র, ভব্য প্রভৃতি

পণ্ডিতদের মতে মহাদেবের পাঁচটা মতবাদই ভিক্ষু সংঘে বিভেদের সূত্রপাত করে এবং উহা প্রধান কারণ ছিল। মহাদেবের শিষ্য নাগস্থবির স্থিরমতি স্থবির প্রভৃতি। ভিক্ষুগণ মহাদেবের মতবাদ সম্রাট কালাশোকের সময় পর্য্যন্ত ব্যাপক প্রচার করেছিলেন।

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের ৩ মাস পরে রাজগৃহে সপ্তপর্ণীগুহায় মগধরাজ অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় পাঁচ শত ষভাভিজ্ঞ অরহৎ নিয়ে দূরদর্শী মহাকশ্যপ বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মবিনয় সংকলন করে প্রথম সংগীতির আয়োজন করেছিলেন। সংগীতির অধিবেশন সমাপ্তির পর দক্ষিণাগিরি পুরাণ স্থবির সংগীতির সম্বন্ধে মন্তব্য করে বলেছিলেন– "সুসংগীতাবুসো *থেরেহি– ভিক্খুহি চ ধম্মো বিনয়োচ, অপিচ যথেব ময়া ভগবতো সম্মাথা সুতং, সম্মুথা পটিগ্গহিতং তথেবাহং ধারে সসামিতি।*" "বন্ধুগণ, স্থবিরগণ ধর্মবিনয় যে সংগীতি করেছেন তাহা সুসংসংগীতি হয়েছে। তবে যাহা কিছু আমি শান্তার মুখে শ্রবণ করেছি, তাহা গ্রহণ করেছি। এবং তাহাই ধারণ করব।"

দক্ষিণগিরি পুরাণ স্থবির উক্ত উক্তি উচ্চারণ করে বিনয়ে ভিক্ষুদের মধ্যে খাদ্য বিষয়ক আট নিয়ম অন্তর্ভুত করতে বুদ্ধ উল্লেখ করেছিলেন বলে নিজেই মত প্রকাশ করেছিলেন। উক্ত আটটা নিয়ম চীনভাষা হতে অনুদিত করে ডাঃ সুজুক প্রকাশ করেছেন– (১) বিহারের অভ্যন্তরে খাদ্য প্রস্তুত করতে পারবে। (২) রান্নাবান্না চলতে পারে (৩) নিজের ইচ্ছামত খাদ্য রান্না করতে পারবে (৪) নিজের ইচ্ছামত খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে (৫) প্রত্যুষে খাদ্য গ্রহণ করতে পারবে। (৬) দাতাদের ইচ্ছানুযায়ী বিহারে খাদ্য নিয়ে যেতে পারবে (৭) বিভিন্ন প্রকার ফলাদি থাকতে পারবে (৮) পুষ্করিনীতে জাত দ্রব্য খেতে পারা যাবে। উপরিউক্ত আটটা নিয়ম কিছু কিছু ভিক্ষু গ্রহণ করে দক্ষিণাগিরি পুরান স্থবিরের অনুগামী হয়ে মহিশাসক নামক নিকায়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বানের এক শত বৎসর পরে বৈশালীতে বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষুগণ বিনয় বহির্ভূত দশ প্রকার নিয়ম বা দশ বথুনী বিনয় সম্মত বলে ঘোষণা করে বিনয় বিরুদ্ধ আচরণ করতেছিলেন। বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষুদের প্রবর্তিত এই দশ বস্তু বিনয় বহির্ভুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দ্বিতীয় সংগীতির আয়োজন করা হয়েছিল। এই সংগীতিতে শিশুনাগ বংশের রাজা কালাশোক পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তিনি প্রথমে বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষুদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লক্ষ্য করে তাদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। পরে তাঁর বোন ভিক্ষুনী নন্দার বিচক্ষণতায় এই সংগীতি অনুষ্ঠানের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

উপরিউক্ত আলোকে পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে বুদ্ধের পরিনির্বানের এক শত বৎসরের মধ্যে প্রধানতঃ তিনটা কারণে ভিক্ষুসংঘ বিভক্তি হয়েছিল। যথা–

(১) দক্ষিণ গিরির পুরাণ স্থবিরের সমর্থক ভিক্ষুগণ মহিশাসক নিকায়ে বিভক্ত হয়েছিলেন।

(২) মহাদেব স্থবিরের পঞ্চবস্তু বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃত মতবাদে একদল ভিক্ষুর সৃষ্টি হয়েছিল।

(৩) বৈশালীতে বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষুগণ বিনয়বহির্ভুত দশবস্তু সমর্থন করে একটা দল ও সম্প্রদায়ের ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

উপরিউক্ত তিনটা কারণ যখন ঘনীভূত হয়ে ভিক্ষু সংঘের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল তখন রাজা কালাশোকের সময় স্থবিরবাদী ভিক্ষুগণ দ্বিতীয় সংগীতির আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষুগণ এই সংগীতির সমাধানে সন্তোষ্ট হতে পারেন নাই। তারা অন্যান্য বিভেদকারী ভিক্ষুদের সমন্বয়ে দশ সহস্রাধিক ভিক্ষুর উপস্থিতিতে কৌসম্বীমন্ডলে এক মহা সম্মেলনের আয়োজন করেন।

এই ভিক্ষু সম্মেলনকে মহাসংঘ সম্মেলন বা মহাসংগীতি অভিধায় অভিহিত করা হয়। এই মহাসংগীতি গৃহীত সিদ্ধান্ত যারা সমর্থন করেছিলেন, তারা মহাসাংঘিক সম্প্রদায় নামে অভিহিত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনে বৌদ্ধধর্মের মূল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে সূত্র ও বিনয়ের কতকাংশ পরিত্যাগ করা হয় এবং নতুন আকারে সূত্র বিনয় সংকলন করা হয়। ধর্ম বিনয়ের এই স্থানের বিষয় অন্য স্থানে সন্নিবেশিত করা হয় এবং অর্থে ও ব্যঞ্জনে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় নাই। দীপবংশে উল্লেখ আছে যে মহাসাংঘিক নিকায়ে পরিবার, অভিধর্ম ও

প্রতিসম্ভিদামার্গ, নির্দ্দেশ এবং জাতকের কিছু অংশ তাদের ধর্ম বিনয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। স্থবিরবাদ হতে পৃথক হয়ে আসে মহাসাংঘিক ভিক্ষুগণ তাদের সংকলিত ধর্মবিনয় ব্যাপক প্রচারের জন্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। মহাসংঘিক ভিক্ষুগণ মগধ হতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে প্রথমতঃ তাঁরা উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিকে তাদের প্রাধান্য বিস্তার করেন। কিন্তু পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বদিকে ও তাদের ভিক্ষুগণ যাভা হতে বোর্ণিও পর্যন্ত ছড়ায়ে পড়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে মহাসাংঘিক ভিক্ষুগণের মধ্যেও ধর্মবিনয়ের সম্বন্ধে বিরোধ শুরু হয়েছিল, তারা নিম্নলিখিত দল বা নিকায়ে বিভক্তি হয়েছিল। যথা–

(১) এক ব্যবহারিক দল- এই দলের মতে সকল ধর্মের প্রচলিত প্রথাগুলি একই ধরণের। সুতরাং এইমতবাদ অবাস্তব। তাদের মতে পরম সত্য এক কিন্তু বিরল ও আকস্মিক।

(২) গোকুলিক বা কৌক্কুটিক (কৌকৃত্য -সংশয়ী) সকল বিষয়ে সন্দেহবাদী। একমাত্র অভিধর্ম ছাড়া অন্যান্য বিষয় বিশ্বাসযোগ্য নহে বলে তারা প্রকাশ করে থাকেন।

(৩) বাহুলিক ও বহুশ্রুতিক মহাদেব স্থবিরের পঞ্চবস্তু স্বীকার করলেও স্থবিরবাদীদের সহিত যোগসূত্র স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। হরিবর্মণের "সত্যসিদ্ধ" তাদের প্রথম ও প্রধান সূত্র গ্রন্থ। তারা সংবৃতি ও পরমার্থ– এই দুই সত্যেবিশ্বাস করতেন। সংবৃত্তি সত্যের সৃষ্টিতে বিশ্বকে ৮৪ তত্ত্বে বিভাজন করা হয়। পরমার্থ সত্যের দৃষ্টিতে সবই শূন্য, তাহাই পরমতত্ত্ব।

(৪) চৈত্যবাদী নিকায়- মহাসাংঘিক নিকায়ের মধ্যে ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রবতর্ক হিসাবে একমাত্র চৈত্যবাদী নিকায়ের আচার্য মহাদেবের নাম পাওয়া যায়। এই মহাদেব মথুরাবাসী পঞ্চবস্তুর প্রবর্তক মহাদেব নহেন, তিনি বিদ্বান, অধ্যবসায়ী ও সাধু পুরুষ ছিলেন। তিনি একটা পর্বত শীর্ষে একটা চৈত্যে অবস্থান করতেন এবং চৈত্য পূজার বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাই তাঁর অনুগামীদের চৈত্যক বা চৈত্যবাদী বলা হয়।

(৫) প্রজ্ঞপ্তিবাদী নিকায়– মহাসাংঘিক সম্প্রদানের মধ্যে প্রজ্ঞপ্তিবাদী নিকায় নামে একটা প্রভাবশালী নিকায় ছিল। তাদের আদর্শ কিরূপ ছিল এবং কোথায় তাদের অবস্থান ছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই।

কথাবথু অর্থকথায় উল্লেখ আছে– "এই পঞ্চ নিকায় মহাসাংঘিক সম্প্রদায় হতে উৎপত্তি হয়েছে। তারা অর্থ, ধর্ম এবং সংঘায়নের সংকলন বিভক্ত করেছিলেন। তারা সংকলনের কঠিন অংশবাদ দিয়ে উহা পরিবর্তন করেছেন। তারা মূল-নাম-উত্থাপন-বিশোধন সম্যক উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে উহাদের অন্যরূপে পরিবর্তন করেছিলেন।"

কথাবথু অট্‌ঠকথায়–এই পাঁচ শাখার কথা উল্লেখ আছে। তবে বাহুলিক বা বহুশ্রুতিক নিকায়ে পরিবর্তে লোকোত্তর বাদ নামক একটা সম্প্রদায়ের কথা আচার্য বসুমিত্র প্রণীত "অষ্টাদশ" নিকায় বিভাগ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। কথাবথু অট্‌ঠকথায় স্থবিরবাদ সম্প্রদায়ের বিভেদকারী নিকায় বা সম্প্রদায়ের কথার উদ্ধৃতি দিচ্ছি– "এদিকে প্রাচীন স্থবির বাদীদের মধ্যে বিভেদ শুরু হয়েছিল। মহিশাসক ও বজ্জীপুত্তক (বাৎসীপুত্রীয়) ভিক্ষুগণ দুইভাগে বিভক্ত হয়েছিল। বজ্জীপুত্তক হতে চার সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল– যথা (১) ধর্মোত্তরীয় (২) ভদ্রযনিক (৩) ছন্নাগারিক ও (৪) সম্মিতীয়। এদিকে মহিশাসক দুইভাগে বিভক্ত হয়ে, যথা– (১) সর্বাস্থিবাদ ও (২) ধর্মগুপ্তিক। সর্বাস্থিবাদ হতে কশ্যপীয় গোত্রের আবির্ভাব হয়। কশ্যপীয় গোত্র হতে সংক্রান্তিক নিকায়ের উদ্ভবহয়। তারপর সংক্রান্তিক বাদী হতে সৌত্রান্তিক বাদী দলের উদ্ভব হয়। এই ১১টি নিকায় স্থবির বাদ হতে বিভক্ত হয়ে এসেছিল।

তারা অর্থ ধর্ম ও সংকলনের কতেকাংশ বিভক্ত করেছিলেন। সংকলনের কঠিন অধ্যায় বাদ দিয়ে নিজেরা তাহা পরিবর্তন করেছিল। তাঁরা মূল-অর্থ-উত্থাপন-বিশোধন-সম্যক উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে উহাদের অন্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

এই পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে, মূল স্থবিরবাদ ছাড়া মোট ১৭টি বিভেদকারী ভিক্ষু সম্প্রদয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে স্থবিরবাদীসহ বৌদ্ধ ধর্মে ১৮টি দল বা নিকায় ছিল। তাদের মধ্যে স্থবির বাদীর প্রকান্ড বৃক্ষের ন্যায় তথাগত বুদ্ধের সকল বিষয়ের কোন অংশ বাদ না দিয়ে অথবা কোন প্রকার মত গ্রহণ না করে সর্বশ্রেষ্ঠ দল বা নিকায় ছিল। অন্যান্য নিকায় এই প্রকান্ড বৃক্ষের

পরগাছায় ন্যায় অনাবশ্যক অতিরিক্ত কর্কটরোগের ন্যায় বিস্তার লাভ করেছিল। পরে আরও ছয়টা দল বা নিকায়ের নাম শুনা যায়। যথা– হৈমবতীক, রাজগিরিক, সিদ্ধাদ্দিক, পূর্বশৈল, অপর শৈল এবং বজিরীয়। এই নিকায় সম্বন্ধে অট্‌ঠকথায উল্লেখ নাই।

(১) মহিশাসক– প্রথম সংগীতির পর দক্ষিণা গিরির পুরাণ স্থবিরের অনুগামীদেরকে মহিশাসক নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু পরে সর্বাস্বস্থিবাদী হতে পরবর্তী মহিশাসকের নিকায়ের উৎপত্তি হয়েছে বলে কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

(২) বজ্জীপুত্তক বা বাৎসীপুত্রীয় নিকায়– বুদ্ধের মৌলিক অনাত্ম দর্শনে আত্মার অস্থিত্ব সম্বন্ধে অস্বীকার করা হলে ও বজ্জীপুত্তক ভিক্ষুগণ পুদ্‌গলের অস্থিত্ব আছে স্বীকার করে একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছিল। এই সম্প্রদায়ের ভিক্ষু সংঘকে পুদ্‌গলবাদীও বলা হয়। কথাবত্থুগ্রন্থে এই পুদগলবাদীদের মতবাদ সর্বপ্রথমেই খন্ডন করা হয়েছে।

(৩) ধর্মোত্তরীয় নিকায়– (৪) ভদ্রযানিক ও (৫) ছন্নাগারিক নিকায়– এই তিন নিকায় অরহতের প্রাপ্তি বিষয়ে সামান্য বিবাদ আছে। তারা স্বীকার করেন যে, অরহতের চ্যুতি আছে। কথাবত্থু গ্রন্থে ভদ্রযানিক মতবাদ "অনুপূব্বাভি সময়" অর্থাৎ চার আর্যসত্যের ক্রম উপলব্ধি ব্যাখ্যায় খণ্ডন করা হয়েছে। ছন্নাগারিকদের মতবাদ "দুক্‌খাহারোহি" অর্থাৎ দুঃখ শব্দ উচ্চারণের দ্বারা জ্ঞানার্জন করা যায়– উক্তি খণ্ডন করা হয়েছে।

(৬) সম্মিতীয় নিকায়- সম্মিতীয়বাদীরা অবন্তীর প্রসিদ্ধ ভিক্ষু মহাকাচ্চায়ন কর্তৃক তাদের মতবাদ প্রবর্তন করেছিলেন বলে স্বীকার করেন। অবন্তীতে এই নিকায়ের প্রবর্তন হয়েছিল বলে এই নিকায়কে অবন্তক নিকায়ও বলা হয়। সারনাথে এই নিকায়ের ভিক্ষুদের অবস্থান সম্বন্ধে জানা যায়। এই নিকায়ের সহিত বজ্জীপুত্তক নিকায়ের মতবাদ পুদ্‌গলের অস্থিত্বের উল্লেখ আছে। কথাবত্থু গ্রন্থে তাদের মতবাদ খন্ডন করা হয়েছে। তবে তারা স্থবির বাদীদের বিনয়ের সহিত সম্পর্ক রেখে "সম্মিতীয় শাস্ত্র" বা "সম্মিতীয় নিকায় শাস্ত্র" সংকলন করেছিলেন।

(৭) সর্বাস্থিবাদী নিকায়– সবাস্থিবাদ নিকায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন ধরণের উল্লেখ দেখা যায়। বেশীরভাগ পণ্ডিতদের মতে মূল স্থবিরবাদ হতে সংস্কৃতে ত্রিপিটকের বিষয় পরিবর্তন করতে গিয়ে এই নিকায়ের সৃষ্টি হয়। এই নিকায়ের মতবাদ সর্বপ্রথম মথুয়া হতে শুরু হয়েছিল। পরে এই মতবাদীরা কাশ্মীর ও গান্ধার রাজ্যে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে তাহা মধ্য এশিয়া এবং চীন রাজ্য পর্যন্ত বিস্তার করেছিলেন।

এই মতবাদের প্রবর্তন বিষয় নিয়ে অশোকাবদান গ্রন্থে একটা উপখ্যান আছে। এক সময়– ভগবান বুদ্ধ সুরসেন রাজ্যে পরিভ্রমণ করে মথুরায় উপনীত হয়েছিলেন। তিনি সেখানে উরুমন্ড নামক এক সবুজ বনভূমি দেখে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন– "তাঁর পরিনির্বাণের এক শত বৎসর পরে নট ও ভট নামক ভ্রাতৃদ্বয় এখানে নটভটবিহার তৈরী করবে। এই বিহারে শমথ ও বিদর্শন ভাবনায় উৎসাহী ভিক্ষুদের ভাবনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ বিরাজ করবে। সেই সময় এক মশলা ব্যবসায়ীর উপগুপ্ত নামক পুত্র ধর্ম প্রচারক হিসাবে আবির্ভুত হবে। সে বুদ্ধের শারীরিক লক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে বুদ্ধের মত হবে। সে আনন্দ স্থবিরের শিষ্য মধ্যান্দিন স্থবিরের কর্তৃক উপসম্পন্ন হবে।" কিন্তু দিব্যাবদান গ্রন্থে উল্লেখ আছে উপগুপ্তের আধ্যাত্মিক আচার্য হবেন সানকবাসী স্থবির এবং মধ্যানন্দ স্থবির তাকে উপসম্পদা দিয়েছিলেন। "অভিধর্ম কোষ ব্যাখ্যা" গ্রন্থে সর্বাস্থিবাদ প্রচারে উপগুপ্তের অবদানের কথা উল্লেখ আছে।

কাশ্মীর ও গান্ধার রাজ্যে সর্বাস্থিবাদ নিকায়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব ইতিহাস আছে। মধ্যন্দিন বা মজঝিন্তি স্থবির সর্বাস্থিবাদ এই রাজ্য প্রবর্তন করেছিলেন। মধান্দিন স্থবির ছিলেন আনন্দ স্থবিরের শিষ্য, সম্ভুতবনবাসীর সমসাময়িক এবং উপগুপ্তের বয়োজ্যেষ্ঠ।

সর্বাস্থিবাদীদের মতে সকল ধর্মের সকল সময় কিছু না কিছু অস্থিত্ব আছে, ছিল এবং থাকবে। সব সময় সবখানে এই অস্তিত্ব একই নিয়মে নাও থাকতে পারে– তবে অস্থিত্ব থাকবে। স্থবিরবাদী ভিক্ষুগণ এই মতবাদ অস্বীকার করে বুদ্ধের অনাত্মবাদ ও অনিত্যবাদ দর্শনের উদাহরণ দিয়ে থাকেন।

(৮) ধর্মগুপ্তিক নিকায়– ধর্মগুপ্তিক সম্প্রদায়ের মধ্যে

স্থবিরবাদ মতের হতে বুদ্ধপূজা ও স্তূপ পূজার বিষয় নিয়ে বিরোধের উৎপত্তি হয়েছিল। তাদের মতে সঙ্ঘপূজা বুদ্ধপূজার চাইতে অধিকতর ফলদায়ী যদিও বুদ্ধ দক্ষিণাধভঙ্গ সূত্রে তার বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে তাঁর জন্য আনীত চীবর সঙ্ঘকে দান করতে বলেছিলেন, তবুও স্থবিরবাদীদের মতে বুদ্ধকে দানই প্রত্যক্ষ ফলদায়ী এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

(৯) কশ্যপীয় নিকায়– কশ্যপীয় নিকায়ের সহিত সর্বাস্থিবাদী নিকায়ের প্রভেদ অতি সামান্য। তাদের মতে অতীত সত্ত্বা অংশতঃ বিদ্যমান এবং ভবিষ্যৎ সত্ত্বা পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু সর্বাস্থিবাদীগণ অতীত সত্ত্বাকে বর্তমানের মত জীবিত বলে বিশ্বাস করতেন।

(১০) সংক্রান্তিক নিকায়– স্থবিরবাদ মতে কশ্যপীয় নিকায় হতে সংক্রান্তিক নিকায়ের উদ্ভব হয়েছে। তাদের মতে ব্যক্তি ও সত্ত্ব একজন্ম হতে জন্মান্তরে রূপে পরিবর্তন করে। তাদের মতে পূদ্গলের মধ্যে পাঁচ স্কন্ধের এমন এক সূক্ষস্কন্ধ আছে, যাহা জন্মান্তরে গ্রহণ করে থাকে।

(১১) সৌত্রান্তিক নিকায়– সৌত্রান্তিক নিকায় মতে সূত্র একমাত্র বুদ্ধ বচন– *"যে সূত্র প্রমাণিকা নতু শাস্ত্র প্রমাণিকা"*। তারা সূত্রকে বুদ্ধবচন বলে বিশ্বাস করতেন কিন্তু অভিধর্মকে বুদ্ধবচন বলে স্বীকার করতেন না। তাদের মতে বুদ্ধ সূত্রের মাধ্যমে অভিধর্মের শিক্ষা দিয়ে গেছেন, পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ধর্মের চার দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌত্রানিক সম্প্রদায় এক বিশিষ্ট স্থানে ছিল।

বুদ্ধোত্তর কালে ভারতীয় ভাষার ইতিহাস ও মহাসাংঘিক সম্প্রদ্রায়ের রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী ঃ

ভগবান বুদ্ধের দর্শনের তিন স্তম্ভের মধ্যে অনিত্যতা অন্যতম। তিনি জাগতিক বিষয়ের পরিবর্তন সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। যদিও মগধী ভাষাকে বৌদ্ধধর্মে আদি এবং দেবমনুষ্যের মধ্যে ভাব আদান প্রদানের ভাষা হিসাবে স্বীকৃত, তবুও বুদ্ধ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, এই ভাষার পরিবর্তন আসবে। তাই তিনি প্রচারিত ধর্মের ভাষাকে মূল কাঠামোতে একটা দীর্ঘস্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য তাঁর শিষ্য কাচ্চায়নকে মগধী ভাষায় ব্যাকরণ রচনা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। বুদ্ধের নির্দেশে কাচ্চায়ন স্থবির জগতে সর্বপ্রথম ভাষার পদ্ধতিগত কাঠামো সঠিক রাখার জন্য "কাচ্চায়ন ব্যাকরণ" রচনা করেছিলেন। এই ব্যাকরণকে ভিত্তি করে ব্যাকরণ রচনার মুল সূত্র সৃষ্টি হয়েছিল।

মহাসাংঘিক ভিক্ষু সম্প্রদায় স্থবিরবাদ মত হতে পৃথক হয়ে পালি ভাষায় তাদের গ্রন্থাবলী রচনা করতে অস্বীকৃতি জানান। বিশেষ করে উত্তর ভারতের বৌদ্ধ সম্প্রদায় পালি ব্যবহার করতেন না। তারা সংস্কৃত প্রাকৃত মিশ্র ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই ভাষার উৎপত্তি তৎকালীন কথ্য সংস্কৃত ভাষা হতে। তাদের ব্যবহৃত ভাষাকে বৌদ্ধ সংস্কৃত বা বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃত বলা হত। কোন কোন পন্ডিত এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলি অর্ধ মগধী ভাষায় রচিত হয়েছে বলে ও মন্তব্য করেছেন। এই অর্ধমগধী ভাষাই বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতি ভাষা।

স্থবির কাচ্চায়নের ব্যাকরণ রচনার জন্য ভারতীয় কথ্য ভাষার একটা বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। শুধু তাহা নহে, বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম সুশৃঙ্খল ভাবে সুবিন্যস্ত করে মহাকশ্যপ অন্যান্য ভারতীয় ধর্মাবলম্বী চক্ষুখোলে দিলেন। মহাকশ্যপের প্রথম সংগীতির পূর্বে ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গ্রন্থাবলী বিক্ষিপ্ত আকারে ছড়ায়ে ছিল। তখন মহাকশ্যপের মত তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলী সূত্রাকারে সংকলন করে ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর ভাষার অর্থ ও ব্যঞ্জন জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করতে ছিলেন। তখন তাদের জন্য সংস্কৃতভাষার একটা বিশুদ্ধ ব্যাকরণ রচনার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। মগধের নন্দ বংশের রাজত্ব কালে (খৃঃ পূঃ ৩৫০-৩০০ অব্দে) অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ প্রণেতা পানিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাবের "শালতুর" নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেবল এবং মাতার নাম দক্ষী দেবী। তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মহাসাংঘিকদের রচিত গ্রন্থ মতে পানিনি অবলোকিতেশ্বরের অনুগ্রহে শব্দশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন। এমন কি তারা তাকে শ্রাবক বোধি প্রাপ্ত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। সংস্কৃত ভাষার একটা পূর্ণ কাঠামোর সৃষ্টি ভারতীয় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্ম সংকলনের কথা

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

এদিকে বুদ্ধের সময়ে নির্জীব ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাদের প্রাচীন মতবাদ প্রচারে আবার মাথাঝাড়া দিয়ে উঠে। তারাও তাদের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সজাগ হয়ে যায়। তারা প্রথমে সংহিতা গ্রন্থ সংগ্রহ করে পুরাণ গ্রন্থাবলী রচনা করতে শুরু করেন। ভারতীয় ষড়দর্শনের চার্বাক দর্শন, সাংখ্যদর্শন, ন্যায় দর্শন, পতঞ্জলী দর্শন এবং বৈশেষিক দর্শন এই সময়ে সূত্রাকারে সংস্কৃত ভাষায় সংকলিত হয়েছিল। অনেক পণ্ডিতদের মতে এই সময়েই রামায়ন; মহাভারত প্রভৃতি মহাকাব্য রচিত হয়েছিল। সর্বশেষের হিন্দু পবিত্র ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদ্‌গীতা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে রচিত হয়েছিল। তাহাছাড়া এই সময়ে জৈন ধর্মের শ্বেতাম্বর ও দিগম্বরের অঙ্গ প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় সংকলিত হয়েছিল।

তারপরে সংস্কৃতি ভাষার উত্থান বৌদ্ধদের আরও মর্মান্তিক। শুঙ্গ রাজত্বকালে রাজা পুষ্যামিত্রের সময় (১৮৫–৭২ খৃঃ পূঃ) সংস্কৃত ব্যাকরণ ভাষ্যকায় পতঞ্জলির আবির্ভাব হয়। তিনি সংস্কৃত ভাষা শুদ্ধ ব্যবহারের জন্য অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি তিনি মগধী ভাষাকে মেচ্ছ ভাষা নামে অভিহিত করেছেন।

এখন আমরা মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের দ্বারা রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীর একটা তালিকা উত্থাপন করার চেষ্টা করবো। আমরা এই পর্যন্ত মহাসাংঘিকদের দ্বারা রচিত গ্রন্থাবলীর কোন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব নাম উদ্ধার করতে পারিনাই। এই গ্রন্থাবলী তারা মূল ত্রিপিটকের গ্রন্থাবলীর সহিত সামঞ্জস্য রেখে বিষয়বস্তু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন। একক কোন গ্রন্থাকার নাই, তাই তারা এইগুলি বুদ্ধ বচন বলতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। মহাসাংঘিক নিকায়ের হতে উদ্ভুত নিকায়ের মধ্যে সর্বাস্থিবাদীদের এবং লোকোত্তরবাদীদের (বাৎস্যপূত্রীয়) সম্পূর্ণ পিটকীয় গ্রন্থাবলী মিশ্র বৌদ্ধ সংস্কৃত এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় নেপাল, কাশ্মীর এবং চীন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এখানে প্রথমে মহাসাংঘিক লোকোত্তরবাদীদের বিনয়ের পুস্তকের তালিকা দিচ্ছি।

লোকোত্তরবাদী বিনয় গ্রন্থাবলী ঃ

(১) ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ বিভঙ্গ
(২) ভিক্ষু প্রকীর্ণক বিনয়
(৩) ভিক্ষু অভিসময় চারিকা ধর্ম
(৪) ভিক্ষুনী প্রাতিমোক্ষ বিভঙ্গ
(৫) ভিক্ষুনী প্রকীর্ণক
(৬) ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ সূত্র
(৭) ভিক্ষুনী প্রাতিমোক্ষ সূত্র

সর্বাস্থিবাদীদের পিটকীয় গ্রন্থাবলী ঃ

(১) সর্বাস্থিবাদী বিনয় গ্রন্থ–

(১) সর্বাস্থিবাদ বিনয় মাতিকা
(২) সর্বাস্থিবাদ বিনয় বিভাষা
(৩) সর্বাস্থি বিনয় সংগ্রহ
(৪) দশাধ্যায় বিনয় নিদান
(৫) দশাধ্যায় বিনয়ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ
(৬) দশাধ্যায় বিনয় ভিক্ষুনী প্রাতিমোক্ষ
(৭) দশাধ্যায় বিনয়

(২) সর্বাস্থি বাদীদের সূত্র পিটক–

(১) দীর্ঘাগাম
(২) মধ্যমাগম
(৩) সংযুক্তাগম
(৪) একোদাগম
(৫) ক্ষুদ্রাগম

(৩) সর্বাস্থিবাদীদের অভিধর্মপিটক ঃ

(১) জ্ঞান প্রস্থান সূত্র
(২) প্রকরণ পাদ
(৩) বিজ্ঞান কায়পাদ
(৪) ধর্মস্কন্ধ
(৫) ধাতুকায়
(৬) সংগীতি পয্যায়
(৭) প্রজ্ঞাপ্তিপাদ

অন্যান্য বৌদ্ধ বিচ্ছিন্নকারী সম্প্রদায়ের দ্বারা বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী নেপাল হতে "বৈপুল্য সূত্র" নামে পাওয়া গেছে। এই বৈপুল্য সূত্রে নয়টা গ্রন্থের নাম উল্লেখ আছে। যথা–

(১) ললিতবিস্তার
(২) সমাধিরাজ সূত্রম
(৩) লংকাবতার সূত্রম
(৪) অষ্ট সাহাস্রকা পারমিতা সূত্রম
(৫) গন্ডব্যুহ সূত্রম
(৬) সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সুত্রম
(৭) দশভূমিক সূত্রম
(৮) সুবর্ণ প্রভাস সূত্রম
(৯) কারণ্ডব্যুহ সূত্রম।

এগুলো ছাড়া মহাসাংঘিক লোকোত্তরবাদীদের মহাবস্তু, বিভিন্ন অবদানগ্রন্থ এই ভিক্ষুদের সংকলিত গ্রন্থ।

সম্রাট অশোকের আমলে বৌদ্ধধর্ম এবং তৃতীয় সংগীতির গুরুত্ব

সম্রাট অশোকের আবির্ভাবে পূর্ববর্তীকালে মগধে বৌদ্ধ ধর্মের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ফাহিয়েন সংকলিত "ভিক্ষুনী প্রাতিমোক্ষ" গ্রন্থের ভূমিকার কিছু অংশ উদ্ধৃতি দিচ্ছি–

"There were 500 monks in Pataliputra during that time (When a good king invited the Buddhist monks to return to Pataliputra). They intended to reach decisions on matters of disciplinary law of the order. There were neither instructors in the Vinaya, nor Vinaya text. nor disciplinary commandments orally handed down. Thus they sent persons to the Jetavan Vihara. who copied the Vinaya Texts whih have remained to be handed down to the present time." Fa Hi hsing copied the Indian (Bramha) text in Magadha at Pataliputra in Devaraja Vihara towards the south of the Asoka Stupa."

Fa Hi hsien continues to report on four different school which differed in regard to the meaning (artha) and the theses(Samaya); (1) Dharma guptaka, (2) Mahisasak; (3) Kasyapiya, (4) Sarvatu. Finally the text (siciu) Schools became confused about their differencis. Fa-Hisien goes on:- "King Asoka asks himself how to decide btween right and wrong in these matters. He parts this question before the Sangha. "How to reach a fair judgement according to the law of the Budha." All tell him that according to the law. They must follow this majority. They king replied, "If that is so one should proceed to vote by tablets (Salaka) in order to know where the majority is. After the vote had taken place, there were those in great number who had picked up the tablets of the original assembly" And as the assembly was in the majority it called it self Maha Sanghika csg the great Assembly."

(জনৈক ধার্মিক রাজা (সম্ভতঃ নন্দরাজ বংশের রাজা) বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে পাটলীপুত্রে প্রত্যাবর্তন করার জন্য আমন্ত্রন করেছিলেন) সেই সময়ে পাটলীপুত্র ৫০০ ভিক্ষু ছিলেন। তাঁরা বিনয়ের নৈতিক বিধান অনুযায়ী এই বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীতি হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে বিনয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার মত কোন শিক্ষক ছিল না। পাঠ্যপুস্তক ও ছিল না। এমন কি শ্রুত পরম্পরা নৈতিক আদেশও ছিল না। এই অবস্থায় তারা জেতবনে লোক পাঠায়ে তাদের দিয়ে বিনয় গ্রন্থের অনুলিপি করেছিলেন। তাহা আজ পর্যন্ত হস্তান্তর হয়ে আসতেছে। ফা-হিয়েন অশোক স্তম্ভের দক্ষিণ দিকে দেবরাজ বিহারে মগধের পাটলীপুত্রে ব্রাহ্মী অক্ষরে প্রতিলিপি করে নিয়েছিলেন।

ফা-হিয়েন আরও উল্লেখ করেন যে - (১) ধর্মগুপ্তিক (২) মহি শাসক (৩) কশ্যপীয় ও (৪) সর্বাস্থিবাদ এই ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থ ও সময় নিয়ে মত বিরোধ আছে। সর্বশেষে পঞ্চ নিকায়ের (স্থবিরবাদসহ) মধ্যে মতপার্থক্য নিয়ে সকলেই বিব্রত হয়ে পড়েছিল। ফা-হিয়েন আরও বলেন - "রাজা অশোক এই ব্যাপারে নিজেই শুদ্ধ ও অশুদ্ধ নিয়ে কিভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো তাহা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি এই বিষয় সঙ্ঘের নিকট উত্থাপন করেন -

"বুদ্ধের বিনয় মতে কিভাবে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়?" সকলেই তাকে বলেছিলেন যে বিনয় মতে সংখ্যাধিক্যকে তাদের মানতে হবে। রাজা উত্তরে বলেন "তাহাই যদি হয়, সংখ্যাধিক্য জানতে হলে শলাকার মাধ্যমে ভোটের প্রয়োজন হয়। ভোট গ্রহণের পর যারা সংখ্যা অধিক ছিলেন তারা মূল ভিক্ষুসংঘের শলাকা উত্তোলন করেছিলেন। যেহেতু এই সঙ্ঘই

সংখ্যাধিক্য ছিল, তাহা মহাসাংঘিক বা মহাসংঘ নামে অভিহিত হল। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের উদ্ধৃতি থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সম্রাট অশোকের রাজত্বে প্রথম দিকে ভিক্ষুদের মধ্যে বিনয়ের বিপর্যয় হয়েছিল এবং যারা ভিক্ষুসংঘ ছিলেন, তাদের মধ্যে মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক ছিল।

সম্রাট অশোকের জীবন বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, অশোক তাঁর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ৬০ হাজার ব্রাহ্মনের অশালীন ভোজন দৃশ্য দেখে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। পরে তিনি তার ভ্রাতৃপুত্র নিগ্রোধ শ্রমনের কমনীয় সৌম্য আচরণ দেখে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তিনি নিগ্রোধ শ্রমনকে তাঁর প্রাসাদে আহবান করতঃ তাঁর নিকট বুদ্ধের বাণী শ্রবণ করে বৌদ্ধ ধর্মের উপাসক হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি নিত্য ৫ লক্ষ মুদ্রার মধ্যে ১ লক্ষ নিগ্রোধ শ্রমনের আমন্ত্রিত ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য এবং ৪ লক্ষ মুদ্রা বৌদ্ধধর্মের উন্নয়নকল্পে ব্যয় করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন ভিক্ষু সঙ্ঘে বিনয়ের বিপর্যয় হওয়াতে ভিক্ষুসংঘ ছয় বৎসর যাবৎ উপোসথ পালনে অসমর্থ হয়েছিলেন। সম্রাট অশোক এই কথা জানতে পেরে ভিক্ষুদের উপোসথ পালনের জন্য ব্যবস্থা করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু ভিক্ষুগণ তার এই আহবানে সাড়া না দেয়াতে সম্রাট অশোকের এক অমাত্য কিছু সংখ্যক ভিক্ষু হত্যা করেছিলেন। এই কথা শুনে সম্রাট অশোক মর্মাহত হয়ে এই হত্যার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য বৌদ্ধ ধর্মে কোন উপায় আছে কিনা অনুসন্ধান করতেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন কোন ভিক্ষু এই অবস্থার উপায় দেখা না পেয়ে সম্রাট অশোককে মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবিরের শরণাপন্ন হতে বলেছিনেন। মোগ্গলীপুত্র তিষ্য সম্রাট অশোককে বৌদ্ধ ধর্ম বিনয় অবহিত করায়ে ভিক্ষুহত্যাতে তার চেতনা নেই বলে এই হত্যার ফল তার উপর বর্তাবে না। তারপর সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের স্থবিরবাদ নিকায়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সর্বাস্থিবাদীরা দাবী করেন যে সম্রাট অশোক তাদের পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন এবং তিনি এই মতবাদের একজন স্বীকৃত পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিভিন্ন অবদান গ্রন্থে মোগ্গলীপুত্র তিষ্য সম্বন্ধে সম্পুর্ণ নীরব থাকে। তারা বলে থাকে যে সর্বাস্থিবাদী উপগুপ্ত সম্রাট অশোকের আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন। এমন কি তারা সম্রাট অশোকের সময় অনুষ্ঠিত তৃতীয় সংগীতি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবিরের সহচর্যে আসার আগে সম্রাট অশোক সর্বাস্থিবাদীদের দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন তাহা অবদান গ্রন্থ থেকে অবহিত হওয়া যায়। যখন তিনি মোগ্গলী পুত্র তিষ্যের প্রভাবে স্থবিরবাদের বিভাজ্যবাদ প্রচারে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন, তখন সর্বাস্থিবাদীদের প্রতিকুল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়াতে তারা পাটলীপুত্র হতে উত্তর দিকে গিয়ে দুইটি স্থানে তাদের কেন্দ্রস্থল নির্ধারিত করেছিলেন। যথা - (১) কাশ্মীর ও গান্ধার রাজ্যে মধ্যন্দিন স্থবিরের নেতৃত্বে একটা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। (২) উপগুপ্তেয় নেতৃত্বে মথুরায় তাদের দ্বিতীয় কেন্দ্রস্থল স্থাপিত করেছিলেন।

সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্মে পরিস্থিতি সম্বন্ধে নলিলাক্ষ দত্তের বিরচিত মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য। সম্রাট অশোকের সময় হতে খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের তিনটা নিকায় পরিলক্ষিত হয়। যথা - (১) স্থবিরবাদ (২) সর্বাস্থিতবাদ ও (৩) মহাসাংঘিক নিকায়। স্থবিরবাদী ভিক্ষুগণ ভারতের কেন্দ্রস্থলে তাদের প্রাধান্য সংরক্ষিত রেখেছিলেন। মহাকাচ্চায়ন স্থবির অবন্তীতে স্থবিরবাদ প্রতিষ্ঠার পর উহার প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন ছিল এবং এখান হতে মহিন্দ স্থবির শ্রীলংকায় স্থবিরবাদ প্রচার করেছিলেন। সর্বাস্থিবাদীরা ভারতের কেন্দ্রীয় অংশের মথুরায় উপগুপ্তের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং মধ্যন্দিক স্থবির উত্তর ভারত হতে সর্বাস্থিবাদ তুখারা, উত্তর পশ্চিম মালয়, পূর্ব-দিকে ও দিবিসা (উড়িষ্যা) এবং কামরূপ পর্যন্ত বিস্তারিত করেছিলেন। মহাসাংঘিক নিকায় বৈশালীতে তাদের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করে উত্তর ভারতে ছড়ায়ে পড়েছিল। এইভাবে বৌদ্ধ ধর্ম এই সময় সমগ্র উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের কিছু অংশে ছড়ায়ে পড়েছিল। যদিও সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন, তিনি তবুও কোন বিশেষ নিকায় বা দলের প্রতি অতিরিক্ত আকর্ষন প্রদর্শন করেন নাই। তাঁর অনুশাসনে ধর্মের নৈতিক দিক বেশী

প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু বিশেষ দল বা নিকায়ের প্রতি কোন প্রকার দুর্বলতা দেখা যায় না । তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু জীবনের চেয়ে গৃহীজীবনের জন্য সৎ জীবনের যাপনের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে তিনি সমানভাবে সকল সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সমর্থন জানায়েছেন। ডাঃ নলিলাক্ষ দত্তের বক্তব্য সম্রাট অশোক মোগ্গলীপুত্র তিষ্যের সহিত সাক্ষাৎকারের পূর্ব পর্যন্ত সত্য হতে পারে। মোগ্গলীপুত্র তিষ্যের সহিত সাক্ষাৎকারে সম্রাট অশোক স্থবিরবাদীদের পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন। তিনি বিভাজ্যবাদ মত তার আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সর্বাস্থিবাদীরা পাটলীপুত্র হতে উত্তর ভারতে গেলে, তথা সম্রাট অশোকের সহিত কোন সম্পর্ক রাখেন নাই। তারা তাদের নিজস্ব মতবাদের অধিষ্ঠিত থাকলেও আরও সম্রাট অশোকের সমর্থন পান নাই। সম্রাট অশোক সাঁচি, কৌসম্বী এবং সারনাথ স্তম্ভে তাঁর অনুশাসনে ভিক্ষুদের মধ্যে সঙ্ঘভেদের পরিণতি সম্বন্ধে কঠোর হুসিয়ার বাণী লিপিবদ্ধ করে প্রমাণ করেছেন যে তিনি একান্তই স্থবিরবাদী। সম্রাট অশোকের সময় স্থবিরবাদের বিশুদ্ধিতা রক্ষার জন্য তৃতীয় সংগীতি বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ভগবান তথগত বুদ্ধের ভবিষ্যৎ বাণীতে উল্লেখ আছে সম্রাট অশোকের সময় মোগ্গলী পুত্র তিষ্যেয় আবির্ভাব হবে। তিনি বিচ্ছিন্নবাদী ভিক্ষুদের মধ্যে অভিধর্ম বিতর্ক মীমাংসা করে অভিধর্মের কথাবত্থু প্রকরণ সংকলন করবেন। মোগ্গলীপুত্রতিষ্য কথাবত্থু প্রকরণ রচনা করে অভিধর্ম পিটকের সাতখন্ড পরিপূর্ণ করেছিলেন। মোগ্গলীপুত্রতিষ্য কথাবত্থু রচনা করে তৃতীয় সংগীতির আয়োজন করে চিন্তা করেছিলেন যে ভগবান বুদ্ধের শাসন প্রত্যন্ত প্রদেশে দীর্ঘ দিন সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাই তিনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নয়স্থানে ধর্মদূতরূপে মহাস্থবিরের প্রণ বৌদ্ধ ধর্মের ভিত সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সম্রাট অশোকোত্তর খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের পরিস্থিতি

সম্রাট অশোকের পর মৌর্য বংশের রাজাগণ খৃঃ পূঃ ১৮৫ বৎসর পর্যন্ত মগধের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তখন স্থবিরবাদী ভিক্ষুগণ ভারতের পশ্চিমাংশে তাঁদের অবস্থান সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মহাসাংঘিকদের ধর্ম প্রচারের বিষয় সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। মৌর্য বংশের পতনের পর বৌদ্ধধর্মে দুর্যোগ নেমে আসে। তখন শুঙ্গ বংশের রাজাগণ পাটালীপুত্রের সিংহাসনে বসেন। শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্র ছত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি মৌর্য বংশের সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে পাটলীপুত্রের সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অবলম্বী ছিলেন এবং বৌদ্ধ বিদ্বেষী বলে পরিচিত ছিলেন। তাহাছাড়া তৎকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বৌদ্ধধর্মের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেয়। সেই সময়ে অর্ধমগধী বা বৌদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতি ভাষার পতন শুরু হয়। সংস্কৃত ব্যাকরন ভাষ্যকার পত্যৎঞ্জলির আবির্ভাব হয়। পত্যৎঞ্জলী রাজা পুষ্যমিত্রকে দুই অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় শুদ্ধ ব্যবহারের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এমন কি তিনি মিশ্র বৌদ্ধ সংস্কৃতভাষাকে মেচ্ছভাষা বলে অভিহিত করতেন। তারই অনুপ্রেরণায় সংহিতা, পুরাণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মে গ্রন্থাবলী বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় সংকলিত হয়েছিল। তখন পাটলীপুত্রে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে রাজানুগ্রহ লাভে ব্যর্থ হয়ে মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষু ভারতের পশ্চিম দিকে যাত্রা করেছিলেন। সেই সময় সর্বাস্থিবাদী বৌদ্ধরা মথুরা, কেরল, কাবুল, নাগার্জুনকান্ডে তাদের কেন্দ্রস্থল প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ পর হতে পাশ্চাত্য দেশের গ্রীক সভ্যতার সহিত ভারতীয় সভ্যতার এক যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিলেন। মৌর্যরাজত্বকালে গ্রীকগন বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে কিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন, তাহা বিশেষভাবে জানা না গেলে সম্রাট অশোকের সময় মোগ্গলীপুত্র তিষ্য যোন ধর্মরক্ষিত মহাস্থবিরকে অপরান্ত দেশে জিনশাসন প্রতিষ্ঠাকরার জন্য প্রেরণ করতে দেখা যায়। মৌর্য রাজত্বের দুইশত বৎসর পর গ্রীকগণ ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই ইন্দো গ্রীক রাজাদের মধ্যে ৩০ জনের নাম পাওয়া গেছে, যারা আফগানীস্থান ও উত্তর পশ্চিম ভারতের শাসক

ছিলেন। গ্রীক রাজাদের মধ্যে রাজা মিলিন্দ পরাক্রমশালী, ন্যায়পরায়ণ ও সুশাসক বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি অলকসান্দা দ্বীপের (বর্তমান কান্দাহার) কলসী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার রাজধানী ছিল সাগলে। (বর্তমান পাঞ্জাবের শিয়ালকোট বলে চিহ্নিত করা হয়েছে)। রাজা মিলিন্দে রাজত্ব পেশোয়ার, কাবুল উপত্যকা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, কাথিয়ার এবং উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

রাজা মিলিন্দ সর্ববিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন এবং সকল বিষয়ে তর্ক করতে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সমকক্ষ কোন তার্কিক না পাওয়াতে তিনি দুঃখ করে বলতেন– "আহা, জম্বুদ্বীপ শূন্যে পরিণত হয়েছে। শুধু বৃথা প্রলাপ ছাড়া এখানে সবই শূন্য।"

একদিন তিনি সাগলে সাংখেয়্য বৌদ্ধ বিহারে নাগসেন স্থবিরের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হন। নাগসেন স্থবির রাজা মিলিন্দকে তার প্রশ্নোত্তরে সন্তোষ্ট করেছিলেন। তখন রাজা মিলিন্দ নাগসেন স্থবিরের নিকট দীক্ষিত হয়ে তাদের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের কথোপকথন শুরু করেছিলেন। তার প্রশ্নোত্তরের পরসংগৃহীত বিষয়াবলী "মিলিন্দ প্রশ্ন" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই মিলিন্দ প্রশ্ন বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি অমূল্য গ্রন্থ। যদিও এই গ্রন্থ বর্তমানে পালি ভাষায় উদ্ধার করা হয়েছে, পণ্ডিত মহলের ধারণা এই গ্রন্থ প্রথমে সংস্কৃত ভাষা সংকলিত হয়েছিল। পরে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা উহা পালি ভাষায় অনুদিত হয়েছিল।

খৃঃ পূর্বঃ ১ম শতাব্দী হতে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস ঃ

খৃষ্টপূর্ব প্রথম হতে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে অষ্টাদশ নিকায়ের মধ্যে স্থবিরবাদ দল ব্যতীত ১৭শ নিকায়ের ভূমিকা ছিল মুখ্য। কিন্তু স্থবিরবাদ নিকায়ের ভূমিকায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এই ১৭শ নিকায়ের বিভিন্ন স্থরে মহাযান মতবাদের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। কিন্তু স্থবির বাদীরা মূল বুদ্ধের বাণীর মধ্যে নিজেদেরকে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রেখেছিলেন। তাই অন্যান্য সম্প্রদায় স্থবিরবাদীদের হীনযান বলে আখ্যায়িত করে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

মহাযান মতবাদের অঙ্কুরিত হওয়ার পূর্বে বিচ্ছিন্নবাদীদের স্বরূপ পরিবর্তনের ধারায় আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যাবলী লক্ষ্য করতে পারি। যথা–

(১) বোধিসত্ত্ব আদর্শ ধারণা বা বোধিসত্ত্বাযান
(২) বোধিসত্ত্ব চর্য্যা বা পারমিতা সিদ্ধান্ত
(৩) বোধিচিত্ত গ্রহণ
(৪) বুদ্ধকে দেবত্ব আরোপ
বুদ্ধপূজা ও বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা
বুদ্ধমূর্তির সহিত ধ্যানীবুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব
মনুষীবুদ্ধের আবির্ভাব, তাদের জ্ঞান শক্তি ও
মঙ্গলের মধ্য বোধিসত্ত্ব মূর্তি ও নারীমূর্তির প্রবর্তন।
(৫) সুখব্যূহ দশ ভূমি কল্পনা
(৬) ত্রিকায়বাদ ধারণা
(৭) মহাযান ধারণার পরিপূর্ণতা

উপরিউক্ত প্রক্রিয়া চলাকালে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মের আরেক পৃষ্ঠপোষক রাজা কনিস্কের আবির্ভাব হয়েছিল। কনিষ্ক ছিলেন কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ট নরপতি। কুষাণ ছিলেন পশ্চিম চীনের উত্তরপশ্চিম অংশে কানু-সু প্রদেশের ইউচি নামক এক যাযাবর জাতির শাখা বিশেষ। এই কুষাণ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কুজল কদ্‌পিসেস।

কুষানের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে বিশেষ ঘটনাগুলি পন্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(১) কুষান রাজত্ব কালে বৌদ্ধধর্ম মধ্যভারত হতে সুদূর মধ্য এশিয়া পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ পুর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।
(২) এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থাবলী পালি ভাষায় পরিবর্তে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল।
(৩) সর্বাস্থিবাদী ও লোকোত্তরবাদীদের প্রভাবে বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধপূজা এবং বুদ্ধমূর্তি প্রচলন এক বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল।
(৪) এই সময়ে ভারতে অষ্টাদশ নিকায়ের চতুর্থসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
(৫) চতুর্থ সংগীতি অনুষ্ঠানের পর বৈভাষিক সম্প্রদয়ের উদ্ভব হয়েছিল।

এখানে উল্লেখযোগ্য কুষাণ রাজাগণ শৈব ধর্মাবলম্বী বলে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়। রাজা কনিস্ক ও প্রথম জীবনে কর্মবাদ বিশ্বাস করতেন না এবং বৌদ্ধ ধর্মকে উপহাস করতেন। কথিত আছে তিনি কাশ্মীর, সমরকন্দ ইয়রকন্দ খোটন জয় করে এই রাজ্যে যুদ্ধের সময় নরহত্যা, রক্তপাত দেখে নিজকে অপরাধী মনে করে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তিনি সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের পরে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার মত একটা পর্যায়ে এসেছিলেন। অনুতপ্ত হৃদয়ে রাজা কনিষ্ক মানসিক শান্তি আশায় তৎকালীন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শরণাপন্ন হলেন। বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে রাজা কনিষ্ক বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধদের জন্য বৌদ্ধ বিহার এবং চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন। কাশ্মীরের প্রধান কনিষ্ক বিহার এবং পেশোয়ারে কনিষ্ক মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংস্পর্শে এসে তিনি বৌদ্ধ ধর্মে বিভিন্ন মতবাদ দেখে কোনটা সঠিক বুদ্ধবচন তাহা উদ্ধার করতে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন। কনিষ্ক পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আচার্য পার্শ্বের পরামর্শে জলকরের কুখনবিহারে মতান্তরে কাশ্মিরীদের কুন্দলবিহারে একটা বৌদ্ধ সংগীতির আয়োজন করেছিলেন।

সর্বাস্থিবাদীদের মতে এই সংগীতি বৌদ্ধ ধর্মের চতুর্থ সংগীতি। এই সংগীতিকে তৎকালীন ভারতের সকল নিকায়ের ভিক্ষুগণ যোগদান করেছিলেন। অসাধারণ পান্ডিত্যে অধিকারী সর্বাস্থিবাদী বসুমিত্র এই সংগীতির সভাপতি ছিলেন। তিনি অরহৎ নন বলে স্থবিরবাদীগণ অভিযোগ করলেও তার পাণ্ডিত্যের জন্য তাকে সভাপতি স্বীকার নিতে হয়েছিল। এই সংগীতির মহা সভাপতি ছিলেন অশ্বঘোষ। এই সংগীতিতে পাঁচ শত ভিক্ষু অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিপিটকের সূত্রপিটককে "উপদেশ শাস্ত্র" নাম দিয়ে ১ লক্ষ সংস্কৃতি শ্লোক, বিনয় পিটককে "বিনয় ভাষা" নাম দিয়ে ১ লক্ষ সংস্কৃত এবং অভিধর্ম পিটককে "অভিধর্ম বিভাগ শাস্ত্র" দিয়ে এক লক্ষ সংস্কৃত শ্লোক রচিত হয়েছিল। ত্রিপিটকের সকল অর্থকথা সংকলন করে সংস্কৃত ভাষায় বিভাষা শাস্ত্র নামে প্রকাশ করা হয়েছিল।

রাজা কনিষ্ক এই সংগীতি সংকলনে গ্রন্থাবলী তাম্রফলকে খোদিত করে একটা স্তূপের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত করে রেখেছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই স্তুপ এবং ত্রিপিটকের তাম্রফলকের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বোধিসত্ত্ব আদর্শ ধারণা বা বোধিসত্ত্ববান

বৌদ্ধ সাহিত্যে জগৎ সৃষ্টি ও প্রলয়ের পর নতুনভাবে পুনঃ বিবর্তনের সময় কল্প হিসাবে গণনা করা হয়। যে কল্পে ভগবান সম্যকবুদ্ধের আবির্ভাব হয় না, সে কল্পকে শূন্য কল্পবলে। যে কল্পে এক বা একাধিক (বেশির পক্ষে পাঁচ জন) সম্যক সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হয়, সে কল্পকে অশূন্য কল্প বলে। সম্যক সম্বুদ্ধ হওয়ার জন্য দশ পারমী, দশ উপপারমী এবং দশ পরমার্থ পারমী পরিপূর্ণ করতে চার অসংখেয় কালসহ লক্ষাধিক কল্প সাধনা করতে হয়। তারপর কোন সাক্ষাৎ বুদ্ধ হতে বুদ্ধ হওয়ার বর প্রার্থনা করতে হয়। কোন ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ বুদ্ধের নিকট বর প্রার্থনা করতে নিম্নলিখিত অষ্টটা গুণ সম্পন্ন অর্জন করতে হয়–

"মনুস্সত্তং, লিঙ্গ সম্পত্তিং হেতু সত্থার দসসনং,
পব্বজ্জা গুণ সম্পত্তি অধিকারো চ ছন্দতা'তি"

মনুষত্ব, পুরুষত্ব, হেতুসম্পত্তি, বুদ্ধ দর্শন, প্রব্রজ্যা, অভিজ্ঞাগুণ, অধিকার এবং অপরাজেয় ইচ্ছাশক্তি।"

এই অষ্টগুণে সমষ্টিত হয়ে যে মহাপুরুষ সাক্ষাৎ বুদ্ধের সম্যক সম্বুদ্ধ হওয়ার প্রার্থনা করেন, তাঁর প্রার্থনা মজুর হয়, এই সময়ে যেই ব্যক্তির নিকট বুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নিহিত হওয়ায় তাকে বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্কুর বলা হয়। এই বর প্রাপ্তির পর বোধিসত্ত্বকে পারমী পরিপূরণের জন্য চার লক্ষ অসংখেয় কাল সহ লক্ষাধিক কল্প অপেক্ষা করতে হয়। তারপর সেই ব্যক্তি দেশ, সময়, বর্ণ, প্রদেশ এবং মাতার আয়ু প্রভৃতি ক্ষেত্র অবলোকন করে জগতে আবির্ভুত হন। সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের দ্বারা সম্যক সম্বুদ্ধ হওয়ার জন্য সম্যক সম্বুদ্ধ ছাড়া আর দুইপ্রকারে দেব মানুষগণ অরহত্ব লাভ করে। নির্বাণ সাক্ষাৎ করে দুঃখ মুক্ত হতে পারেন। যথা (১) প্রত্যেক বুদ্ধ ও (২) বুদ্ধের শ্রাবকগণ। প্রত্যেক দুই অসংখ্যের কালসহ লক্ষাধিক কল্প পারমী পূর্ণ করে প্রত্যেকবুদ্ধ হতে পারেন। কিন্তু তিনি শুধু নিজেই চতুরার্য সত্য উপলব্ধি করে অরহত্ব প্রাপ্ত হন। অপরকে অরহত্ব প্রাপ্তির জন্য চতুরার্য সত্যের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন না এবং তার ধর্ম প্রচারের উৎসাহ

ও নাই। সম্যক সম্বুদ্ধ নিজের চেষ্টায় বুদ্ধ হয়ে নিজেই মুক্ত হয়ে অপরকেও মুক্তির পথ প্রকাশ করতে পারেন। সম্যক বুদ্ধের উৎপত্তি না হলে জগতে অন্ধকার থাকবে এবং অরহত্ব লাভের জন্য চতুরার্য সত্যের ব্যাখ্যা দেয়ায় কেহ না থাকতে মানুষ অরহত্ব লাভ করতে পারবেন না। তাই বুদ্ধোৎপত্তিতে যে বুদ্ধের শিষ্য অরহত্ব লাভ করে থাকেন, তাহাদিগকে বুদ্ধের শ্রাবকবুদ্ধ বলা হয়। বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্ঘ বিভেদকারীরা উপরিউক্ত তিন প্রকারে অরহত্ব প্রাপ্তিতে ব্যর্থ হয়ে বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের আদর্শকে তাদের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে নিম্নউক্ত গাথায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করে থাকেন।

কিংমে একেন তিন্নেন পুরিসেন থামদসিনা
সব্ব ঞঞুতং পাপুনিত্বা সন্তারে সসং সদেবকে।

অথবা

কিং মে অঞঞাত বেসেন ধম্মং সচ্চিকতেনিধ
সব্বঞঞূত পাপুনিত্বা বুদ্ধো হেস্সং সদেবকে।

বাংলা– আমার ন্যায় শক্তি সম্পন্ন পুরুষের পক্ষে একাকী মুক্ত হওয়ার কিইবা সার্থকতা আছে ? সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করে দেবমানুষ্যদের মুক্তির পথ প্রদর্শন করাব।

অথবা,

আমি কেন জনসাধারণের অজ্ঞাতসারে ধর্ম প্রত্যক্ষ করব? আমি সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করে দেবমানুষদের মধ্যে বুদ্ধ হব।

ভগবান সম্যক বুদ্ধের উক্ত উক্তির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে একদল বৌদ্ধভিক্ষু বোধিসত্ত্ব যানের আদর্শ গ্রহণ করেছেন বলে প্রচার করতে থাকেন। তারা বোধিসত্ত্বের আদর্শ থেকে এক ধাপ এগিয়ে প্রচার করতে থাকেন যে জগতের একটি প্রাণী ও মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তারা নিজেদের মুক্তি হতে চান না। কিন্তু বৌদ্ধমতে অনন্ত জগতের অনন্ত সত্ত্বের একই সাথে মুক্তির কোন হেতু নাই।

বোধিসত্ত্ব চর্চা বা পারমিতা

আমাদের গৌতম বুদ্ধ সুমেধ তাপস জন্মে লোকবিদ্ দীপঙ্কর বুদ্ধ হতে বুদ্ধ হওয়ার বর লাভ করে বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্কুর নামে পরিচিত হন। তিনি তখন বুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পারমী পরিপূরণের "বোধিপাচন ধম্মা" বা "বুদ্ধকারক ধম্মা" সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন।

হন্দ বুদ্ধ করে ধম্মে বিচিনামি ইতোচিতো
উদ্ধং অধো দস দিসায়াবতা ধম্ম ধাতুয়া।

"অতএব আমি উদ্ধ অধঃ আদি দশদিক যতদূর পর্যন্ত স্বভাব ধর্ম বিদ্যমান আছে (কামলোক, রূপলোক এবং অরূপলোক) ততদূর পর্যন্ত বুদ্ধত্ব লাভের হেতুভূত ধর্ম সমূহ আচরণ করব।"

সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব একে একে দশপারমী উপ পারমী এবং পরমার্থ পারমী সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন। তিনি দান পারমী, শীল পারমী, নৈষ্ক্রম্য পারমী, প্রজ্ঞা পারমী, বীর্য পারমী, ক্ষান্তি পারমী, সত্য পারমী, অধিষ্ঠান পারমী, মৈত্রী পারমী ও উপেক্ষা পারমী - এই দশ পারমী পূরণের প্রত্যেকটা পয্যায় সুক্ষ্মরূপে বিচার বিশ্লেষণ করে বোধিসত্ত্ব জীবন শুরু করেছিলেন। এই বোধিসত্ত্ব জীবন চর্চা বা পারমিতাই বুদ্ধ করণীয় ধর্ম।

বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব জীবনে পারমী পূরণের জন্য বিভিন্ন প্রাণীতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বোধিসত্ত্ব জীবনের কাহিনীগুলো বৌদ্ধ সাহিত্যে জাতক নামক গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। মহাসাংগিক সম্প্রদায়ের জাতকের অনুসরণে সাধারন মানুষকে বোধিসত্ত্বযানের প্রতি আকর্ষন সৃষ্টি করার জন্য সংস্কৃত ভাষায় অবদান গ্রন্থ রচনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। যেমন - দিব্যাবদান, অশোকাবদান, কল্পদ্রমাবদান মালা, রত্নাবদান মালা, দ্বাবিংশ শতাবদান, ভদ্রকল্পাবদান, ব্রতাবদান মালা, বিচ্চিক কর্মিকাবদান প্রভৃতি। দিব্যাবদান এবং মহাবস্তু প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধত্ব লাভ করার জন্য প্রথমে বোধিচিত্ত উৎপাদন করতে হবে এবং বুদ্ধত্ব হওয়ার জন্য অভিপ্রায়ী ব্যক্তিকে চৈত্যপূজা এবং দানাদি পূণ্য করতে হবে। সম্যক সম্বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ ও শ্রাবক বুদ্ধদের মধ্যে বিমুক্তির ব্যাপারে কোন তফাৎ নাই। বোধিসত্ত্বযান অনুমোদনের প্রথম পর্যায়ে তারা বিমুক্তির জন্য চার চর্চার কথা বর্ণনা করেছেন। যথা – (১) প্রকৃতিচর্চা (২) প্রণিধান চর্চা (৩) অনুলোম চর্চা ও (৪) অনিবর্তন চর্চা। বোধিসত্ত্ব প্রকৃতিচর্চা হল পৃথকজনের জীবন চর্চা। প্রণিধান চর্চায় বোধিচিত্ত উৎপাদিত হয়। অনুলোম চর্চায় বোধিসত্ত্ব দশভূমির মধ্যে ছয়টি ভূমিতে অবতীর্ণ হতে পারবেন, অনিবর্তন চর্চায় বোধিসত্ত্ব শেষ চার ভূমির মধ্যে একটা ভূমিতে অবস্থান করবেন। এই

শেষ চার ভূমি হতে তিনি আর চ্যুত হবেন না।

মহা সাংঘিক ভিক্ষু সম্প্রদায় বোধিচিত্ত উৎপাদনের দশ পারমী মত কঠিন উপায় চাইতে সহজ উপায় করার জন্য ছয় পারমী গ্রহণ করেন। তৎমধ্যে ধ্যান পারমী নুতন একটা পারমী যোগ করে। এতে তাদের পারমীর নামে হল - দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা। তারা জনসাধারণকে বোধিচিত্ত উৎপাদনের ছয়টা পারমী সম্বলিত বুদ্ধের জীবনের সহিত এবং অন্যান্য বুদ্ধের শিষ্যের সহিত উপাখ্যানের পর উপাখ্যান সংযোজন করতে থাকেন। তাতে সন্তুষ্ট হতে না পেরে তারা তাদের নিজস্ব আরও চার পারমী যোগ করে দশ ভূমি সূত্র রচনা করে দশ পারমীর নাম প্রচার করতে থাকেন। চারটা সংযোজিত পারমী নাম হল - উপারকৌ শল্য, প্রণিধান, বল এবং জ্ঞান। পারমী সম্বন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া সম্পাদিত দশ পারমী ও চরিয়া পিটক (সানুবাদ) দ্রষ্টব্য।

বোধিচিত্ত গ্রহণ

স্থবিরবাদীদের মতে নিয়ম দুই প্রকার - যথা (১) সম্মত্ত নিয়ম ও (২) মিচ্ছত্ত নিয়ম। সম্মত্ত নিয়মে বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মচর্য ও আর্যমার্গ অনুশীলন করে পারমী পূরণ করতঃ বিমুক্তি লাভ করে থাকেন। মিচ্ছ নিয়ম অর্থ - আনন্তরীয় কর্ম অর্থ অকুশলকর্ম করে পরিণামে নরক ভোগ করতে হয়। মহাসাংঘিক সম্প্রদায় বোধিচিত্ত উৎপাদনকারীকে বোধিসত্ত্ব নিয়ম বলা হয়ে থাকে। তাদের মতে সিদ্ধার্থ গৌতম বোধিসত্ত্ব অবস্থায় পারমী পূর্ণ করেছিলেন। তিনি কশ্যপবুদ্ধের সময় যখন জ্যোতিপাল মানবক হিসাবে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, তখন বোধিচিত্ত উৎপাদন করেছিলেন। তাদের মতে বোধিচিত্ত উৎপাদন করতে পারলে বৌদ্ধ হউক অথবা অবৌদ্ধ হউক যে কোন কেহ বিমুক্তি লাভ করতে পারবেন। তাদের মতে যে মুহুর্তে বোধিচিত্ত উৎপাদিত হয়েছে, সেই মুহুর্তেই বোধিসত্ত্ব হয় এবং বুদ্ধ হওয়ায় নিয়ম নির্ধারিত হয়।

পরে শান্তিদেব বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে বোধিচিত্ত গ্রহণের জন্য দুই প্রকার কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা (১) বোধি প্রণিধচিত্ত ও (২) বোধিপ্রস্থান চিত্ত। বোধি প্রণিধ অর্থ বোধিচিত্ত প্রাপ্তির জন্য অধিষ্ঠান করা। বোধিপ্রস্থান চিত্ত বোধি চিত্ত প্রাপ্তির জন্য অনুশীলন করা (প্রস্থান অর্থ চলন)। আচার্য শান্তিদেব তার "শিক্ষা সমুচ্চয়" অধ্যায়ে বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে বোধি চিত্তোপাদনের জন্য সপ্তবিধ অনুত্তর পূজার নির্দেশ দিয়েছেন। যথা (১) বন্দনা, (২) পূজনা (৩) পাপ দেশনা (৪) পূন্যানুমোদনা (৫) বুদ্ধাধ্যেষনা (৬) বুদ্ধযাচনা (৭) বোধিচিত্ত পরিনামিনা।

বুদ্ধকে দেবত্ব আরোপ এবং বুদ্ধপূজা ও বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণ

সংযুক্ত নিকায়ে উল্লেখ আছে -

"ভগবান লোকে জাতো, লোকে সম্বুদ্ধো লোকং অভিভূয্য বিহরতি অনুপলিতো লোকনা'তি।"

বুদ্ধ এই জগতে জন্ম গ্রহণ করেছেন, সম্বুদ্ধ প্রাপ্তি হয়েছে। তিনি এই জগৎ জয় করেছেন কিন্তু জাগতিক বিষয়ে অনুলিপ্ত ছিলেন না। বুদ্ধের উপস্থিতি ঐতিহাসিক সত্য হলে ও সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধদের মধ্যে বুদ্ধ মূর্তি পূজার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বুদ্ধের প্রতীকরূপে রিক্ত আসন, ধর্মচক্র, বোধিপত্র, বোধিবৃক্ষ, পদ্ম, পাদুকা এবং বুদ্ধের দেহাবশেষ সংরক্ষিত স্তুপ পূজা করা হত। বুদ্ধবন্দনা, উপাসনা এবং উপোসথ পালন করা বৌদ্ধদের নিত্য স্বীকৃত অনুষ্ঠান। বুদ্ধ অনুস্থিতিতে বুদ্ধের শারীরিক বস্তু, ব্যবহারিক বস্তুবাদ এবং উদ্দেশিক বস্তুকে বৌদ্ধগণ পূজা ও বন্দনা করে আসছিলেন।

মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রশাখায় ভগবান বুদ্ধের অনন্ত গুণাবলীর স্বরূপ উদ্ধার করতে ব্যর্থ হযে বুদ্ধকে দেবত্ব আরোপ করা হয়। বৈপুল্যবাদীদের মতে শাক্যমুনি বুদ্ধ কখন ও মনুষ্যলোকে অবস্থা করেন নাই। তিনি তুষিত লোকেই অবস্থান করতেন। দেবতা ও মনুষ্যগণ শুধু তাঁর ছায়া মাত্র দর্শন করতেন। তিনি জীবের প্রতি করুণাবাদ সময় সময় মনুষ্যলোকে উপস্থিত হবেন মাত্র। কিন্তু তিনি কোন কাকেও ধর্মোপদেশ দেন নাই। যিনি ধর্মোপদেশ করেছেন তিনি হলেন বুদ্ধের নির্ম্মানকায়, এই নিম্মানকায়কে বৌদ্ধগণ পূজা করেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে চার প্রকার কায়ের উল্লেখ আছে। যথা - (১) চাতুমহাভোতিক কায় (২) মনোময়কায় (৩) ধর্মকায় ও (৪) নির্মাণ কায়। চাতুমহাভোতিক কায় বলতে সিদ্ধার্থ জন্মের পর পরিনির্বাণ পর্যন্ত জাগতিক

কায় বুঝায়। মনোময় কায় বলতে রূপীদেবতাদের কায় বুঝায়। বুদ্ধ তার প্রবর্তিত ধর্মদেশনা সমূহকে ধর্মকায় বুঝায়েছেন। বুদ্ধ এমনকি তারা মহাশক্তিবান শিষ্যরাও অলৌকিক শক্তি প্রভাবে নির্মানকায়ে সৃষ্টি করতে পারতেন। তাই মহাসাংঘিকদের নির্মানকায়ের সহিত স্থবিরবাদীদের নির্মাণকায়ের সম্পর্ক নাই। পরবর্তীকালে মহাসাংঘিকরা ত্রিবিধ কায়ের উল্লেখ করেছেন। যথা - (১) নির্মাণকায় (২) সম্ভোগ কায় ও (৩) ধর্মকায়। এই ভাবে বুদ্ধকে দেবত্ব আরোপ করে মহাসাংঘিক সম্প্রদায়গণ প্রথমে বুদ্ধপূজা শুরু করেন। এদিকে মথুরায়, সর্বাস্থিবাদী সর্বপ্রথম বুদ্ধমূর্ত্তি নির্মাণাকারে বুদ্ধ পূজা শুরু করেছেন। বুদ্ধকে দেবত্ব আরোপ তাঁরা মাথায় প্রভামণ্ডলী রচনার নিয়মও প্রবর্তিত হয়েছিল। তারপর কাশ্মীর ও গান্ধারায় গ্রীক কায়দায় পাগড়ী মণ্ডিত পেশী বহুল বুদ্ধ মূর্তি তৈয়ার হয়েছিল। ঐতিহাসিক রাজা কণিষ্কের সময় হতে বুদ্ধ মুর্তির একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তার ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয়কে সম্মুখে রেখে বোধিসত্ত্ব মূর্তি শুরু হল। বোধিসত্ব মূর্তিতে রূপাত্মক, গুণাত্মক ও ধ্যানাত্মক তিনটা কাল্পনিক বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব হল। যথা - (১) মঞ্জুশ্রী (২) পদ্মাপানি বা অবলোকতেশ্বর এবং (৩) বজ্রপাণি। তারপর বুদ্ধমূর্তিতে তিন প্রকার মূর্তির সৃষ্টি হল। যথা– (১) ধ্যানীবুদ্ধ (২) বোধিসত্ত্ব ও (৩) মানুষীবুদ্ধ। এমনকি বুদ্ধকে হিন্দুগণ বিষ্ণু অবতার বলে তাদের দশ অবতারের এক পার্শ্বে স্থান দিয়েছিল। তারপর অবলোকিতেশ্বর শক্তি দেবী মূর্তি তারায় আবির্ভাব হয়। তারাদেবীর বিভিন্নরূপ ভেদ আছে– যেমন শ্যামা তারা, পীততারা, শ্বেত তারা ইত্যাদি। নারী প্রতিমা বুদ্ধমূর্তি সাথে স্থান পাওয়াতে বুদ্ধ মুদ্রা ও পরিবর্তন হতে এবং মস্তক ও হস্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে। আমরা বৌদ্ধধর্মে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ত্রিকায়বাদ ও দশভূমি সম্বন্ধে আমাদের আলোচনায় উল্লেখ করছি। এখন মহাযান ধারণার পরিপূর্ণ প্রাপ্তির বিষয় আলোচনা করবো।

মহাযান ধারণার পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি

বৌদ্ধধর্মে মহাযান সম্প্রদায়ের পরির্পূতা প্রাপ্তির পূর্বে খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দী হতে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধ দর্শনের চার সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। যথা– (১) বৈভাষিক (২) সৌত্রান্তিক (৩) শূন্যবাদ মাধ্যমিক ও (৪) যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সম্রাট কনিষ্কের আমলে চতুর্থ মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এই সংগীতিতে বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিপিটকের অর্থকথা সমূহ সংস্কৃত ভাষায় বিভাষা- - নামে সংকলিত হয়েছিল। এই বিভাষাশাস্ত্রের প্রণেতা মহাচার্য অশ্ব ঘোষ। কিন্তু এই মহা সংগীতি বসুমিত্র সভাপতি ছিলেন। তিনি সর্বাস্থিবাদ পন্থী ছিলেন। তিনি অরহৎ ছিলেন না। তাই স্থবিরবাদী বাসী এই সংগীতিকে কার্যক্রম স্বীকার করেন না। তাই বৈভাষিক সম্প্রদায়কে স্থবিরবাদী বলে কোন কোন পন্ডিতদাবী করলেও তারা প্রকৃত পক্ষে স্থবিরবাদীদের দ্বারা অস্বীকৃত ছিলেন।

সৌত্রান্তিক বাদী খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে স্থবিরবাদী হতে পৃথক হতে আসেন। তবে বৈভাষিক সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশের পর এই সম্প্রদায়ের কার্যক্রম বর্ধিত হয়। তাই এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কুমার লব্ধ বা কুমারলাতকে স্বীকার করা হয়। ডঃ অনুকুল বন্দোপাধ্যায় কুমার লাতের শিষ্য হরিবর্মনের (খৃঃ ২য় শতাব্দী) নাম ও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এই সম্প্রদায় অভিধর্ম পিটক বর্জন করে একমাত্র সূত্র পিটকই তাদের প্রামান্য গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

মাধ্যমিক শূন্যবাদ ঃ

মাধ্যমিক শূন্যবাদের মূল বা প্রাচীন প্রবক্তাছিলেন আচার্য নাগার্জুন। মাধ্যমিক শূন্যবাদ প্রধানতঃ নাগার্জুনের মধ্যম শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। নাগার্জুন দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন রাজত্বের রাজা যজ্ঞশ্রী গৌতমী এর (১৬৬ – ১৯৬ খৃষ্টাব্দ) সমসাময়িক ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের শূন্যতা বাদের উপর তার মাধ্যমিক কারিকা বা মাধ্যমিক শাস্ত্রে ৪০০ কারিকা ২৭ পরিচ্ছেদে সম্পন্ন করেছিলেন। নাগার্জুন প্রতীত্যসমুৎপাদকে ভিত্তিকে শূন্যতাবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে নির্বান দর্শনকে গুলায়ে পেলেছেন। স্থবিরবাদীরা নির্বানকে শূন্য বলে। এখানে শূন্য অর্থাৎ রাগ-দ্বেষ-মোহ শূন্য, সর্ববিধ সংস্কার শূন্য। নাগার্জুনের শূন্যবাদে জাগতিক সকল বস্তুকে অস্থি-নাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। পরবর্তীকালে নাগার্জুন প্রজ্ঞা পারমিতা সূত্রের উপর ভিত্তি করেই মাধ্যমিক শূন্যবাদ দর্শনের বিকাশ সাধন করেছিলেন। তাই মাধ্যমিক শূন্যবাদ মহাযান বৌদ্ধ দর্শনের সৃষ্টি বিশেষ সহায়তা করেছিলেন।

যোগাচার বিজ্ঞানবাদ সম্প্রদায়–

যোগাচার বিজ্ঞানবাদ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মৈত্রেয় বা মৈত্রেয় নাথ। মৈত্রেয় নাথের শিষ্য অসঙ্গ (৩৫০ খৃষ্টাব্দ) যোগাচার দর্শনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার। বোধিলাভের জন্য যোগমার্গের উপর নির্ভর করতে হয় বিশ্বাস করতেন বলে এই সম্প্রদায়কে যোগাচার দর্শন বলা হয়। এই যোগাচার সম্প্রদায়ই বৌদ্ধ ধর্মে তান্ত্রিকা বা তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপের সূত্র সৃষ্টি করেছিলেন। যোগাচার মতে বোধিসত্ত্বকে বোধিসত্ত্বর বা বুদ্ধত্ব লাভের জন্য দশ ভূমি স্তর অতিক্রম করতে হয়। যোগাচার দর্শনকে বিজ্ঞানবাদ ও বলা হতে থাকে। অসঙ্গের সহিত তার ভাই বসুবন্ধু ও যোগাচার স্পর্শনের পুস্তক রচনা করেন। বসুবন্ধু ও যোগাচার দর্শনের পুস্তক রচনা করেন। বসুবন্ধু প্রথমে সর্বাস্থবিরবাদী মতে বিশ্বাসী ছিলেন। পরে তিনি অসঙ্গের অনুপ্রেরণায় যোগাচার দর্শন চর্চা করতে থাকেন।

যোগাচার দর্শন স্থবিরবাদীদের বাস্তববাদকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এই দর্শন হল একান্তভাবে আদর্শবাদী। ইহা শুধু বিজ্ঞপ্তি স্বীকার করে অর্থাৎ কোন কিছু অস্থিত্ব নাই শুধু চিত্ত, মন বা বিজ্ঞান একমাত্র সত্য ও অপর সব মিথ্যা। তারা দর্শনের ব্যবহারিক দিকটাই যোগাচার দেখায়েছে অপরদিকে বিজ্ঞানবাদ ইহাদের অনুমানিক সত্যের উপর ন্যস্ত। এক কথায় বিজ্ঞানমাত্তা এই পরমার্থিক সত্য। এই শাখায় অসংগ বসুবন্ধু স্থিরমতি ছাড়াও দিঙনাগ (৫ম শতাব্দী) ধর্মপাল (৭ম শতাব্দী) ধর্মকীর্তি (৭ম শতাব্দী) শান্ত রক্ষিত (৮ম শতাব্দী), কমলশীল (৮ম শতাব্দী) প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিক ও তর্ক শাস্ত্রবিদ যোগাচার সম্প্রদায় সম্বন্ধে চর্চা করে গেছেন।

খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত উপরিউক্ত চার সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষু তাদের নিজ নিজ মত নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বৈভাষিক ভিক্ষুদের সর্বাস্থিবাদ প্রাধান্য থাকাতে, সৌত্রান্তিক ভিক্ষুদের অভিধর্মকে অস্বীকার করতে, মাধ্যমিক শূন্যবাদ প্রতীত্যসমুৎপাদের নির্বানের অপব্যখ্যাতে এবং যোগাচার বিজ্ঞানবাদে বিজ্ঞানকে শুদ্ধ পরমার্থ সত্যে চিহ্নিত করাতে স্থবিরবাদের অস্থিত্বের উপর বিরাট আঘাত এসেছিল। এমন কি ভারতে স্থবিরবাদের অট্ঠকথা সহ বিনয়ের প্রতি উদাসীনতার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

এদিকে এই চারটা দার্শনিক মত নিজেদের মধ্যে বিচার বিশ্লেষন করে বৈজ্ঞানিক ও সৌত্রান্তিকদের হীনযান এবং মাধ্যমিক শূন্যবাদ এবং যোগাচার বিজ্ঞানবাদ কে মহাযান নামে আখ্যায়িত করতে থাকেন। প্রকৃত পক্ষে এই চারটা দার্শনিক মতবাদ মূল স্থবিরবাদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের মধ্যে মত পার্থক্যের জন্য এই দুই নামে অভিহিত হয়।

খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী হতে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পরিস্থিতি

সম্রাট অশোকের পর ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পরিবর্তনের ইতিহাস এবং মহাযান সম্প্রদায়ের উদ্ভবের বিচ্ছিন্ন ইতিহাস আমরা বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থাবলী হতে উদ্ধার করতে পারলেও খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী হতে ৭ম শতাব্দীর ইতিহাস আমরা ভারতে না পেলেও চীন দেশ হতে তিন বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ হতে পাই। এই তিন জন চৈনিক পরিব্রাজক হলেন–

(১) ফ্রা- হিয়েন-ফা হিয়েন দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের রাজত্বকালে (খ্রিষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী) ভারত পরিভ্রমণে এসে ছয় বৎসর ভারতে অবস্থান করে বৌদ্ধধর্ম বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। তিনি তার ভ্রমণ শেষে লিখেছেন যে তিনি চীনের ছ'অংন হতে মধ্য ভারতে আসতে ছয় বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন, মধ্য ভারতে ছয় অবস্থান করেছিলেন এবং পুনঃবার চীনের চিংটোতে পৌঁছতে তাকে আর তিন বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত করতে হয়েছিল।

(২) হুয়েন সাং (৬০২–৬৬৪) হুয়েন সাং সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংগ ও বসুবন্ধুর শিষ্য ও আচার্য শীলভদ্রের নিকট যোগাচার বিজ্ঞানবাদ শিক্ষা করেছিলেন। হুয়েন সাং ৬২৯ হতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৬ বৎসর ধরে ভারতে অবস্থান করে ভারতের বৌদ্ধধর্ম ও ইতিহাসের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ডঃ বেনীমাধব বড়ুয়া উল্লেখ করেন যে এই চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাং ভারতে সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিনি মগধী বা পালি ভাষার সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই।

(৩) ইৎসিং- (৬৩৪–৭১৩)- ইৎসিৎ হুয়েন সাং এর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পর ভারতে আগমন করেন। তিনি নালন্দায় মূল সর্বাস্থিবাদ নিকায়ের বিনয় গ্রন্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারতে আগমন করেন। নালন্দায় ১০ বৎসর অতিবাহিত করেন। তিনি প্রায় ত্রিশ দেশ ভ্রমণ করেন ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে চীন প্রত্যাগমন করেন।

চৈনিক পরিব্রাজক ব্যতীত ভারতে বুদ্ধঘোষের আবির্ভাব ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পরিস্থিতি নির্ণয়ের জন্য একটা গুরুত্বর্পূ উপাদান। বুদ্ধঘোষ শ্রীলংকার রাজা মহানামের (৪০৯–৪৩১) রাজত্বে শ্রীলংকায় গমন করে মহাবিহারে অবস্থান করে সিংহলী ভাষা হতে ত্রিপিটকের অর্থকথা মগধী বা পালি ভাষায় অনুবাদ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য শ্রীলংকার তৎকালীন সময়ে মহাযানীর প্রভাব ছিল। মহানাম ছিলেন অভয়গিরির ভিক্ষুদের প্রতি অনুরক্ত কিন্তু তার স্ত্রী ছিলেন মহাবিহারের ভিক্ষুর ভক্ত। বুদ্ধঘোষের সময় ভারতে পালি সাহিত্য সম্বন্ধে মহাবংশ উল্লেখ যে বুদ্ধঘোষের উপাধ্যায় বেরত মহাস্থবির তাঁকে বলেছিলেন যে, ভারতে বর্তমানে শুধু ত্রিপিটক গ্রন্থাবলী পালি ভাষায় আছে। উহার অট্‌ঠকথা নাই। কারণ অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, বসুবন্ধু, দিভাবনাগ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বৌদ্ধধর্মের মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ে সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থাদি রচনা করেছিলেন। এদিকে পালি ও স্থবিরবাদী বৌদ্ধদের ক্রিয়াকলাপ ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। স্থবিরবাদ ভিক্ষুগণ বৌদ্ধ গয়ায় আশে পার্শ্বকেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েন। বুদ্ধঘোষ বুদ্ধগয়া মন্দিরে অধ্যক্ষ রেবত মহাস্থবিরের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করে বৌদ্ধ ধর্মের স্থবিরবাদ সম্বন্ধে জানবার জন্য কৌতুহল প্রকাশ করলে রেবত মহাস্থবির তাকে শ্রীলংকায় গিয়ে ত্রিপিটকের অর্থকথা মগধী বা পালি ভাষায় অনুদিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হতে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুপ্ত বংশের রাজা এবং বর্ধন বংশের রাজা হর্ষবর্ধন রাজত্ব করছিলেন। হর্ষবর্ধন প্রথমে স্থবিরবাদের বিচ্ছিন্ন শাখা সমিতিয় সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, পরে তিনি হুয়েন সাং প্রভাবে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাহাছাড়া এই সময়ে হুনরাজ মিহির এবং গৌড়রাজ শশাঙ্ক দুইজনই ভীষণ বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন। কলহনে রাজ তরাঙ্গনীতে মিহিরকুলের বৌদ্ধ ধর্ম বিদ্বেষী কার্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যায়। হুয়েন সাং এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে এবং মহাযান ধর্মগ্রন্থ মঞ্জুশ্রী মূলকম্পলতাতেও মিহির কুলের বৌদ্ধ বিদ্বেষীর কথা উল্লেখ আছে। হুয়েন সাং-এর তথ্যমতে মিহির কুল বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা করার জন্য একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত প্রার্থনা করলে তাঁর জন্য একজন অযোগ্য ভিক্ষু পাঠানো হয়। এতে ক্ষুদ্ধ হয়ে তিনি সমগ্র দেশ ব্যাপী বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘের উচ্ছেদের আদেশ দেন। প্রথমে তিনি বৌদ্ধরাজা বালাদিত্যের সহিত যুদ্ধে মগধরাজ্যের নিকটবন্দী হয়েছিলেন। পরে মিহিরকুল কাশ্মীরের রাজ সিংহাসন অধিকার করে বৌদ্ধদিগের প্রতি নির্যাতন শুরু করেন। মিহির কুল শত শত স্তূপ, সংঘারাম এবং বৌদ্ধভিক্ষু ধ্বংস করেছিলেন। এমনকি তিনি নিজের আত্মীয় স্বজনকে পর্যন্ত রেহাই দেননি। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে গিয়ে তিনি নিজেই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

গৌড়রাজ শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষের ইতিহাস আরও মর্মান্তিক। হুয়েন সাং শশাঙ্কের বৌদ্ধদের অত্যাচার সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। শশাঙ্ক কুশীনগরের বৌদ্ধ ভিক্ষু দিগকে উৎখাত করেছিলেন। তিনি পাটলিপুত্রে বুদ্ধের পদচিহ্ন সম্বলিত একটি পবিত্র শিলা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করেছিলেন এবং বুদ্ধগয়ার পবিত্র বোধিবৃক্ষ উৎপাদিত করে অবশিষ্টাংশ অগ্নি সংযোগ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে একসূত্র থেকে জানা যায় বোধিবৃক্ষ জনৈক বৌদ্ধভিক্ষু মাটি স্তুপের আড়ালে রক্ষা করেছিলেন। গৌড়রাজ শশাঙ্ক পাপের ফল কুষ্ঠারোগাক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত কষ্টভোগ করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।

এদিকে গুপ্তযুগে গুপ্তরাজাদের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তারা বুদ্ধকে হিন্দুদিগের দশ অবতারের মধ্য নবম অবতার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দী মধ্যে পুরাণোর গাথাগুলিতে, সপ্তম শতাব্দীর মহাবলি পুরাণের পল্লবস্তম্ভে উৎকীর্ণ গাথায় বিষ্ণুনবম অবতার হিসাবে বুদ্ধকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাহা ছাড়া বায়ু পুরাণ ও বিষ্ণু পুরাণে বুদ্ধকে মোহিনী শক্তি সম্পন্ন পুরুষ বলা হয়েছে। পদ্ম পুরাণের "ক্রিয়া যোগসারে" বুদ্ধের ভূয়সী প্রশংসা করে হিন্দু

দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। ভাগবত পুরাণেও বুদ্ধের উল্লেখ আছে। বরাহ মিহির "বৃহৎসংহিতার" বুদ্ধকে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপরি উল্লিখিত সময়ে ভারতে স্থবিরবাদীদের করুণ অবস্থা। ফাহিয়েন মহাযান বৌদ্ধদের বর্ণনায় বৌদ্ধগণ রাজানুগ্রহ ছাড়াও গতিশীল ছিলেন। কিন্তু হুয়েন সাং বৌদ্ধদের ক্রম অবনতির কথা উল্লেখ করেছে। তবে তিনি ভারতে বিভিন্ন জায়গায় মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিদ্যমান অবস্থা লক্ষ্য করেছেন। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম ভারত হতে উত্তর দক্ষিণে ছড়ায়ে পড়েছিল।

অষ্টম শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের পরিস্থিতি

অষ্টম শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চার শত বৎসরের ভারতে ব্রাহ্মন্য ধর্মের পুনরুত্থানের এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, বৌদ্ধ ধর্ম ভারত হতে পূর্ব দিকে পাল রাজাদের অনুগ্রহ লাভ করেও আর বৌদ্ধ ধর্ম রইল না। এই সময় কুমারিল ভট্ট, উদ্যোতকর, শংকরাচার্য, উদয়নাচার্য, রামানুজাচার্য, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃত ধর্মাচার্যগণ বৌদ্ধ ধর্ম বিরোধী প্রচারণার ব্যাপৃত ছিলেন। পালরাজাগণের রাজত্বকালে মহাযানে যোগাচার বিজ্ঞানবাদ অনুশীলনের দ্বারা কতকগুলি গুর রহস্যমূলক গূঢ় বিদ্যায় প্রচার করেছিলেন। ফলে ভারতের ধর্মীয় আদিম ধারণা মায়াবিদ্যা এবং যেই অতীন্দ্রিয় বাদ বৌদ্ধ ধর্মে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। আদিম যৌন অতীন্দ্রিয়বাদের সহিত মন্ত্র, মুদ্রা, ধারণী মন্ডল, প্রভৃতি গুপ্তবিদ্যার সহিত সংমিশ্রিত হয়ে বৌদ্ধ ধর্মে মন্ত্রযান, তন্ত্রযান, সহজযান, কাল চক্র যান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, এই তন্ত্রমন্ত্র সাধনার ভারতের নালন্দা, উদন্তপুরী, বিক্রমশীলা, জগদ্দল বিহার বিখ্যাত ছিল। এই বিহারে বিখ্যাত পণ্ডিতদের মধ্যে অসংগের শিষ্য ধর্মকীর্তি হতে শুরু করে শীলভদ্র, শান্তরক্ষিত, জেতারী, অতীশ দীপঙ্কর, কমলশীল, প্রর্ভতি অনেক আচার্যের আবির্ভাব হয়েছিল। এই সময়ে এই আচার্যগণ বৌদ্ধ ধর্মে পঞ্চ 'ম' কার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পঞ্চমকার- মৎস্য, মদ্য, মাংস, মাৎমর্য, ও মুদ্রা বা মৈথুন। বৌদ্ধ ধর্মে এই তন্ত্রমন্ত্র যান সম্বন্ধে যত কম আলোচনা হয়, ততই বৌদ্ধদের জন্য মঙ্গল। এই পঞ্চ 'ম' সম্বন্বিত বৌদ্ধদের সর্বশেষ অধঃপতনের অন্য কারণ মূসলমানসের বাংলাদেশ আক্রমণ। খৃষ্টীয় একাদশ শতব্দীর শেষ ভাগে মুহাম্মদ বিন ইক্তিয়ার খিলজী কুতুবুদ্দিনের সেনাপতি ছিলেন। তিনি তৎকালীন বাংলাদেশের রাজা লক্ষণ সেন কে পরাজিত করে বাংলাদেশ মুসলিম আধিপাত্য প্রতিষ্ঠাতা করেন। তারপর বৌদ্ধ বিহার গুলিতে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং বৌদ্ধ ধর্ম পুস্তক সমূহ সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেন। মুসলমানদের অমানবিক অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরে বৌদ্ধগণ বাংলা সীমান্ত এলাকার নেপাল, তিব্বত এবং চট্টগ্রামে পালায়ে প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু তাদের সহায় সম্বল বলতে আর কিছু রইল না।

বাংলাদেশে পাল রাজাদের পূর্বে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ইতিহাস এখনও পযন্ত উদ্ধার করা হয় নাই। ভগবান তথাগত বুদ্ধ বাংলাদেশ পদার্পণ করেছেন বলে বৌদ্ধ সাহিত্যে কোন নিদর্শন নাই। একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত "বোধিসত্ত্বাবদান কল্প কথায়" সুমগধা অবদান নামক উপাখ্যানে অনাথপিন্ডিকের কন্যা সুমগধার পুষ্প মারফৎ ঋদ্ধি শক্তির আমন্ত্রণে বুদ্ধ পূন্ড্রবর্ধনে এসেছিলেন, তিনি সুমগধা নিমন্ত্রণ রক্ষা করে সশিষ্য পুনঃ আকাশমার্গে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তাহা ছাড়া সম্রাট অশোকের সময় বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে কোন নিদর্শন নাই। হুয়েন সাং যে কিংবদন্তীয় অবধারণা করেছেন, তাহাতে তিনি বুদ্ধ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করে তিন মাস ধর্ম প্রচার করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন, সার সংগ্রহ মতে বুদ্ধ প্রত্যন্ত প্রদেশে গমন করলেও তিনি মধ্য প্রদেশে এসে রাত্রি যাপন করতেন। তাই হুয়েন সাং এর উদ্ধৃতি গ্রহনযোগ্য নহে। অশোকাবদান ও দিব্যাবদান গ্রন্থে পুন্ড্রবর্ধনে সম্রাট অশাক কর্তৃক বুদ্ধাবিদ্বেষী নিগ্রন্থ উপাসক দের হত্যার কথা উল্লেখ করে সম্রাট অশোকের পুন্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের কথা পন্ডিত মহলের বিবেচ্য।

ঐতিহাসিক সূত্র মতে গুপ্তযুগে বাংলাদেশে গুপ্ত সম্রাজ্যভূক্ত হয়েছিল। এই সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম পাঞ্জাব হতে বাংলাদেশ এলাকায় বিস্তৃতি ছিল উল্লেখ করেছেন। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি এই স্থবিরবাদ ভারত ভূখন্ডে বুদ্ধ গয়ায় বুদ্ধ মন্দিরে রেবত মহাস্থবির বুদ্ধঘোষকে বলেছিলেন ভারতে ত্রিপিটক মাত্র আছে। অট্‌ঠকথা নাই। তাই এই সময়ে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার হলে, তাহা মহাযান বৌদ্ধধর্ম ছিল। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার সংকলনে এবং রচনায় কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের বা প্রচারকের উল্লেখ না থাকাতে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের গুরু শিষ্য পরম্পরা কোন তথ্য নাই। মহাসাংঘিক বৌদ্ধ প্রচারের ঢেউ তৎকালীন বাংলাদেশে এসে ঠেকেছিল বলে মনে হয়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগ (৫০৭-৬ খৃষ্টাব্দে) ত্রিপুরা জেলায় গুনাইঘর নামক গ্রামে মহারাজ বৈন্যগুপ্তের ভূমিদান বিষয়ক এক খানি তাম্র শাসন উদ্ধার হয়েছে। গুপ্তযুগে এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের এইটাই সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। এই তাম্রশাসনে মহারাজ রুদ্ধদন্ড তিনটি উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন– (১) মহাযান পন্থী ভিক্ষু শান্তিদেবের জন্য রুদ্ধদত্ত ও আর্য অবলাকিতেশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃতকে আশ্রম বিহার নির্মাণ করেদিয়েছেন। তার সংরক্ষণের জন্য (২) শান্তিদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত (বৈবর্তিক ও অবৈবর্তিক) নামে মহাযানী ভিক্ষু সংঘ কর্তৃক এই বিহারে স্থাপিত বুদ্ধ মুর্তির দৈনন্দিন তিনবার গন্ধ, পুজাদি সহ পূজার জন্য ও (৩) এই বিহারের অধিবাসী উক্ত ভিক্ষুসঙ্ঘের অশন, বসন, শয্যাসন ও ভেষজের জন্য। বাংলাদেম প্রথম প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান সম্প্রদায়ই ছিল, তাহা এই নিদর্শন হতে প্রমানিত হয়।

এখন আমরা পালযুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করব। বাংলাদেশের রাজনৈতিক আভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও বহিরাগত শত্রু আক্রমণের সর্বত্র অরাজতার সূত্রপাত হলে স্থানীয় শাসকগণ পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকায় "মাৎস্য ন্যায়ের" নীতি চালিয়েছিল। এই অবস্থায় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে "প্রাকৃতজন" বা জনসাধারণ প্রথম গোপালদেব নামক এক সামন্তরাজকে বাংলাদেশের রাজ সিংহাসনের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। গোপালদের বাংলাদেশের এই অরাজতা দূরীভূত করে পাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই বংশের সতের জন নৃপতি প্রায় চারশত বৎসর ধরে এই রাজ্যে রাজত্ব করেছিলেন। পাল রাজাগণ নিজেরা মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাদের আমলে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের অধঃপতনের শেষ সীমায় গিয়েছিল। মুসলমান বিজয় সহজ হয়েছিল। পালদের দ্বিতীয় রাজা ধর্ম পাল ৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মগধে বিক্রমশীলা বিহার প্রতিষ্ঠা করে মঞ্জুশ্রী মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন। দেবপালের আমলে বজ্রযানে সূর্তিকাগার নালন্দা বিহার আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান রূপে স্বীকৃত পেয়েছিল। প্রথম মহীপালের পুত্র ন্যায়পালের সময় অতীশ দীপঙ্কর বাংলাদেশ হতে তিব্বতে গিয়ে লামাবাদ প্রচার করেছিলেন। পালরাজাদের আমলে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সিদ্ধাচার্য নামে চর্চাগীতি রচনা করে বাংলাভাষায় প্রাথমিক স্তরের স্বরূপ সৃষ্টি করেছিলেন। দুঃখের সহিত উল্লেখ করতে হচ্ছে বাংলাভাষা ইতিহাস খুঁজতে তিব্বতে যেতে হয়েছিল। তাহাছাড়া খৃষ্টীয় অষ্টম হতে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে তিনটা বৌদ্ধ রাজবংশের রাজত্ব সম্বন্ধে জানা যায়। কুমিল্লায় অনতিদূরবর্তী কামতা নামক নগরে চারজন খগড়বংশীয় বৌদ্ধ রাজার নাম উদ্ধার করা হয়েছে। যথা – (১) খড়েগাদ্যস (২) জাতখড়গ (৩) দৈবখড়গ (৪) যুবরাজ রাজরাজ ভট্ট। দ্বিতীয় বৌদ্ধরাজাদের মধ্যে কান্তিদেব অন্যতম। তিনি পূর্ববংশে চন্দ্রবংশের রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মগধে পাল বংশীয় রাজাদের পতনের পর সেন রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেনরাজাগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তারা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিদ্বেষীভাষ প্রদর্শন না করলেও বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই। সেন রাজাদের আমলে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম বাংলা বিহার হতে ব্রহ্মদেশের পাগান, পেগু, আরকান ও কোকি প্রভৃতি স্থানে বিস্তার লাভ করেছিল।

চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে বৌদ্ধদের অধিবাস। এখানে পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ী বৌদ্ধ এবং চট্টগ্রামের সমতল অঞ্চলে বড়ুয়া বৌদ্ধগণ দীর্ঘদিন ধরে বাস করে আসছেন। জাতিগত দিক থেকে এই বৌদ্ধ এক ধর্মিষ্ঠ জাতির বংশধর। তারা অষ্টিক তিবেতোবর্মন, দ্রবিড়

এবং আর্য জাতির বংশ হতে উদ্ভব হয়েছে। আমরা আমাদের আলোচনায় বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব। বড়ুয়া বৌদ্ধগন মগধ বা বিহার হতে এখানে বসতি স্থাপন করেছে বলে দাবী করে। তবে এই ব্যাপারে ঐতিহাসিক তত্ত্ব অতি নগন্য। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে চন্দ্রসুরিয় নামক রাজ বংশ আরকানে বৌদ্ধ সামন্ত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই রাজাগণ বারানসীর সমুদ্রদেবের বংশধর এবং এই বংশের ৫০ রাজা আরকানে রাজত্ব করেছিলেন। এই সময়ে বিহার বা মগধ হতে কিছু কিছু লোক চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন বলে মনে হয়। কথিত আছে তাদের সময় আরকানে সর্বপ্রথম মহামুনি বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু আরকানের রাজনৈতিক ইতিহাসে তারা তাদের পাঁচ হাজার বৎসরের ইতিহাস আছে বলে দাবী করে। প্রাচীন কালে আরকানে প্রায় ২১টা উপজাতি বাস করত। এই উপজাতিদের একত্রিত করে কপিলাবস্তুনগরের রাজপুত্র মারযু ধন্যবতী নগরে সর্বপ্রথম ধন্যবতী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তারপর ধন্যবতীতে কনজ্যগ্রী নামক রাজা ধন্যবতীতে দ্বিতীয়বার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পূর্ব উল্লেখিত চন্দ্রসূরির রাজবংশ ধন্যাবতীতে তৃতীয় রাজবংশ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। তারা আরকানে ১০১৮ খৃষ্টাব্দে পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। আরকানে মগধগত বৌদ্ধ রাজাদের রাজত্ব কালে চট্টগ্রামের ভৌগলিক অবস্থান সম্বন্ধে কোন তত্ত্বমূলক নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তবে বঙ্গোপসাগরের অঞ্চলগুলিতে হরিকেল, বঙ্গ, সমতট চন্দ্রদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে নাম পাওয়া গেলেও চট্টগ্রামের নাম পাওয়া যায় নাই। "চট্টগ্রাম" শব্দ যে উৎস হতে উৎপত্তি হউক না কেন উহা অত্যন্ত আধুনিক মনে হয়। তিব্বতীয় সূত্রে 'চটিঘাবো" নামক শহরে পন্ডিতবিহার নামাক বিহারের অস্থিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে ইৎসিৎ পূর্ব ভারতের সর্বপুর্ব স্থান হরিকেল হতে শ্রীলংকায় গিয়েছিলেন। উল্লেখ আছে হরিকেল কান্তিদেব চন্দ্রবংশের রাজা ছিলেন। চট্টগ্রামের পন্ডিত বিহারের অধ্যক্ষ তিলোপদ বাংলা দেশের পাল রাজত্বে মহিপাল (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী) সমসাময়িক ছিলেন। চট্টগ্রাম রাজনৈতিক ইতিহাস ও উদ্ধার করা হয় নাই। পাল আমলে চট্টগ্রাম পন্ডিত বিহারে বৌদ্ধ ধর্মের তন্দ্রযান চর্চা হত। চট্টগ্রাম তিলোপাদ সহ কয়েক সিদ্ধাচার্যদের নাম উদ্ধার করা হয়েছে। নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম হরিকেল রাজ্যভূক্ত ছিল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম আরকান রাজ্যভূক্ত হয়। একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম পগাঁ সাম্রাজ্যভূক্ত ছিল। পগাঁ রাজা ত্রিপুরা রাজ্যে রাজত্ব করতেন। ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে নরমিখকলা আরাকানের রাজা হন। তারপর থেকে চট্টগ্রাম আরকানের অধীনে ছিল। আরকানী রাজারা কিন্তু নিজদের নামের সঙ্গে একটা মুসলমান নাম ব্যবহার করতেন। ত্রিপুরার রাজা কিছু সময়ের জন্য চট্টগ্রাম দখল করলেও প্রায় সময়ই চট্টগ্রাম আরকানের অধীনে ছিল। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম দখল করে দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্য ভুক্ত করেন। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানী চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করেছিল। চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধদের সহিত আরকান রাজাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী চন্দ্রসূরীয় বংশ রাজত্বকালে মহাযানী বৌদ্ধগণ চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করলে তারাই পরে সিদ্ধাচার্যদের বংশধর হিসাবে বসবাস করে আসতেছেন। কিন্তু চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধদের মধ্যে নিজস্ব কতকগুলি কিংবদন্তী আছে যার দ্বারা তারা মগধাগত বলে দাবী করে। শ্রীউমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দী লিখিত "বড়ুয়া জাতি" পুস্তিকায় উল্লেখ আছে "নালন্দা বিহার বিধ্বসে ও ভিক্ষুগণকে হত্যা করা হইলে মগধের (বিহারের) বৃজি জাতীয় এক রাজপুত্র তাহার ৭০০ জ্ঞাতিগোত্র ও সৈন্যসহ দেশ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে চট্টগ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন।" ডঃ বেণী মাধব বড়ুয়া বিরচিত "বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি" গ্রন্থের মুখবন্ধে উল্লেখ আছে– কথিত আছে– সাত ঘর মাত্র বড়ুয়া চট্টগ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। যারা বর্তমান বড়ুয়া সমাজের মূল মানব উপাদান এবং ইহা ক্রমশঃ সংখ্যায় বর্দ্ধিত ও বর্হিদেশস্থ কতিপয় গোষ্ঠী ও পরিবারের সহিত সমন্বিত হইয়া সমাজে পরিণত হইয়াছে।" শ্রী ধর্মতিলক স্থবির কর্তৃক অনুদিত "সদ্ধর্ম রত্নাকর" গ্রন্থে বুড়াগোঁসাই চক্রশালা ও (চেদির পুনির তীর্থের ইতিবৃত্ত নামক পরিচ্ছেদে) চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ আছে ছান্দমা নামে জনৈক ব্যক্তি মগধ হতে আকিয়াবের ছান্দমা

পাহাড়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। তিনি সেই পাহাড়ে অবস্থান করতেন। তারই নামে ছান্দমা পাহাড় নামে পরিচিত ছিল। তার দুই ছেলে ছিল। চেন্দি এবং রাজমঙ্গল। রাজমঙ্গল ভিক্ষু জীবন ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। চেন্দির তিন পুত্র ছিল। কেজগ্নি, কেয় কচু ও বৃন্দাবন। কেয়কচু ভিক্ষু ব্রত গ্রহণ করলে চন্দ্র জ্যোতি নামকরণ করা হয়েছিল। তিনি মগধবাসী দীপঙ্কর মহাস্থবিরের শিষ্য সরভু মহাস্থবিরের নিকট ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ভিক্ষুব্রত নিয়ে তিনি ব্রহ্মদেশের মৌলমেইনে বিশ বৎসর যাবৎ বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। তারপর তিনি দশ বৎসর ব্রহ্মদেশীয় ভিক্ষুসহ একখানা চক্রাসন , তিনট বিভঙ্গ বুদ্ধ মূর্তি এবং কয়েক খন্ড বুদ্ধাস্থি নিয়ে স্বদেশের পথে যাত্রা করেন। প্রথমে তিনি আগড়তলা লালমাই পাহাড় আশ্রম স্থাপন করে এবং সেখানে ১০০জনকে ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষা দেন। সেখানে পাঁচ বৎসর অবস্থান করেন তিনি পথিমধ্যে সীতাকুন্ড পাহাড়ের উচ্চতম শিখরে একখানি আশ্রম স্থাপন করেন। উক্ত স্থানে ত্রিভঙ্গ বুদ্ধ মূর্তি স্থাপন পূর্বক একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তার নামানুসারে সীতাকুন্ডের পাহাড় নামে চন্দ্রশেখর নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে উহা চন্দ্রনাথ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের জনপদ অর্থ সামর্থ্যের প্রবল প্রভাবপ্রতিপত্তির অভাবের সুযোগ নিয়ে হিন্দুগণ চন্দ্রশেখরের উত্তর পার্শ্বে একটি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছে। উক্ত শিব মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে জনৈক পাহাড়ী মুরুং নির্মিত একটা চৈত্যের ভগ্নাংশ এখনও বিদ্যমান আছে। এই স্থানে তিন পাথরের ভগ্নাংশ আছে। এই তিন ভগ্নাংশ চন্দ্র জ্যোতি স্থবিরের ত্রিভঙ্গ বুদ্ধমূর্তির শেষ নিদর্শন। বর্তমানে জনৈক জে, চৌধুরী কর্তৃক তার প্রয়াত ছেলে নির্বাণ কামনায় উৎকীর্ণ একটা শ্বেত পাথর এই চৈত্যের অবস্থান নির্ধারিত করা আছে। উহাতে নিম্নলিখিত লিপি উল্লেখ আছে–

These Ancient Buddhists relics were dug out for destruction by iconocts. They were-instated by J. Chowdhury Bar-at law and dedicated to Goutama Buddha in memory of his beloved son Joydeva, Professor Bengal Engineering College, Who attained Nirvan on 3rd August 1933 in his 30th year.

14/9/1936

সীতাকুন্ডে কিছু দিন অবস্থান করে চন্দ্র জ্যোতি ভিক্ষু শ্রীমতি পাহাড়ী ছড়ার তীরে হাইডমজ্যা নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। এবং তাঁর অনুরোধ চক্রাসনখানি তাকে প্রদান করেন। হাইডমজ্জা হাইড গাঁও গ্রামে চক্রাসন স্তূপ করে চক্রশালা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর তিনি পিতৃক স্থান চরকিয়াতে গমন করেন। চন্দ্রজ্যোতি ভিক্ষু পিতা চেন্দি তার প্রদত্ত বুদ্ধাস্থি সাতকানিয়া, হরিণা নামক স্থানে একটা ধাতুচৈত্য নির্মাণ করেন এবং একটা পুষ্করিনা খনন করেন। উক্ত স্থানের নাম চেদির পুকুর। তাছাড়া চন্দ্রজ্যোতি ভিক্ষু সীতাকুন্ডের পান্থশালা গ্রামে, চট্টগ্রাম শহরে রংমহল পাহাড়ে অবস্থান করে তাঁর পিতৃব্য রাজমঙ্গল প্রতিষ্ঠিত ঠেগরপুনি গ্রামে অবস্থান করেছিলেন এবং সেখানে তাঁর আনীতি ত্রিভঙ্গ বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে একটা মন্দির নির্মান করেছিলেন। বর্তমানে এই ত্রিভঙ্গ বুদ্ধ মূর্তির দুই অংশ পাওয়া গেছে। উহা ঠেগরপুনির বুড়াই গোসাই নামে খ্যাত। জার্মান বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক পন্ডিত ডাঃ হেনজ বেহার্ট (উর. Heinz Behert) মনে করেন যে চন্দ্রজ্যোতিঃ ভিক্ষু খৃষ্টীয় পঞ্চাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। কিন্তু চট্টগ্রামে স্থবিরবাদী বৌদ্ধধর্মের কোন নিদর্শন সঙ্ঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের আগমনের পূর্বে কোথায় কোন তথ্য উদ্ধার করা যায় নাই। এখানে শ্রীলংকার রাজা তিষ্য মহিন্দ স্থবিরকে যে প্রশ্ন করেছিলেন উহা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। মহিন্দ স্থবির শ্রীলংকার বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে শ্রীলংকাবাসীদের বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট করেছিলেন এবং রাজাকে উপাসক হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তখন তিনি মহিন্দ স্থবিরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন - "ভন্তে, শ্রীলংকায় এখন কি বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ?" উত্তরে মহিন্দ স্থবির বলেছিলেন – "যে দিন শ্রীলংকার অধিবাসী ভিক্ষুসঙ্ঘে দীক্ষিত হয়ে শ্রীলংকার ভাষায় ধর্মালোচনা করতে সক্ষম হবে, তখন শ্রীলংকার বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে।" চট্টগ্রামে এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম শিষ্য পরম্পরা বৌদ্ধভিক্ষু এবং আঞ্চলিক ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মের কোন নির্দেশন পাওয়া যায় নাই। তাহাছাড়া চট্টগ্রামে প্রাচীনবৌদ্ধ ধর্মীয় পুস্তকগুলি "হানাউক" ভাষায় "তাদোয়াং" "আগরতরা" "মঘা খনৌজা" প্রভৃতি

মহাযান বৌদ্ধধর্মের সহিত তন্ত্রমন্ত্রযানের মিশ্রিত বৌদ্ধধর্ম। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আরকানের সঙ্ঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির চট্টগ্রামে এসে সর্বপ্রথম স্থবিরবাদ বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এখানে আরকানের স্থবিরবাদ বৌদ্ধধর্মের তথ্য আলোচনা করা হচ্ছে। কারণ আরকানে খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর চন্দ্র সূরিয় রাজাদের আমল হতে মহাসাংঘিক বৌদ্ধধর্ম প্রচার হয়েছিল। তখন সেখানে সর্বপ্রথম মহামুনি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর বাংলাদেশ হতে গুপ্ত আমলে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করা হয়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্রহ্মদেশের সিংহাসনে আরোহন করে রাজা অনিরুদ্ধ এক বিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি আরকান রাজ্য তার রাজ্যের অন্তর্ভক্ত করেন। এবং সর্বপ্রথম আরকানে স্থবিরবাদ বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামন্তপাসাদিকা, দীপবংশ, মহাবংশ শাসন বংশ প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্মীয় বিষয়ক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সম্রাট অশোকের সময়ে মোগ্গলীপুত্র তিষ্যের নির্দেশে সোন উত্তর স্থবিরদ্বয় আকাশমার্গে সুবর্ণ ভূমিতে মোনসম্প্রদায়ের রাজা সিরিমাশোকের রাজত্বকালে স্থবিরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন। সুবর্ণ ভূমির সঠিক অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার মতামত না থাকলেও বর্তমানে নিম্ন ব্রহ্মদেশের সুবর্ণপুর (বর্তমান থাটন) কে সুবর্ণভূমি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মোন সম্প্রদায়ের ব্রহ্মদেশী বাসীগণ দীর্ঘ দিন ধরে সোন উত্তর প্রচারিত স্থবিরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম সংরক্ষণ করে আসছিলেন। রাজা (অনিরুদ্ধ (১০৪৪-১০৭৭) ব্রহ্মদেশের সিংহাসনে আরোহন কালে যেখানে মহাযান বৌদ্ধধর্মের তন্দ্রমন্ত্র যান প্রচলিত ছিল। সেই সময়ে রাজা অনিরুদ্ধ অরহন্ত স্থবির নিকট স্থবিরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে অবগত হয়ে তাঁর নিকট বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। অরহন্ত স্থবির রাজাকে নিম্ন ব্রহ্মদেশের সুবর্ণপুর হতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রমাণিক গ্রন্থাদি আনয়নের পরামর্শ দেন। কিন্তু সুবর্ণপুরের রাজা মনোহরি (মনুহ) তার নিকট বুদ্ধদেশিত ত্রিপিটক গ্রন্থ এবং বুদ্ধের দেহাবশেষ পাঠাতে অস্বীকৃত দান করেন। রাজা অনিরুদ্ধ মোন আক্রমণ করে রাজা মনোহরি সহ সমস্ত বৌদ্ধ শাস্ত্র ও বুদ্ধের অস্থিধাতু বত্রিশটা শ্বেত হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহন করায়েউত্তর ব্রহ্মদেশে নিয়ে আসেন। রাজা অনিরুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থাবলী সহিত শ্রীলংকায় বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর একই মিল দেখে সন্তোষ্ট হয়ে সমগ্র ব্রহ্মদেশের স্থবিরবাদ প্রচার করেছিলেন। তিনি আরকান রাজ্য তার রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করে আরকানে স্থবিরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আরকানী সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির চট্টগ্রামে এসে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে রাউজান উপজেলায় 'হাঞ্চাত্তর ঘোনা' নামক এক পার্বত্য ছড়ায় উদক উপেক্ষ সীমায়' স্থবিরবাদী বিনয় ভিক্ষুদের উপসম্পদা দান করে সর্বপ্রথম স্থবিরবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বাঙালীজাতির নব জাগরণে বৌদ্ধ ধর্মের পরিস্থিতি

উনবিংশ শতাব্দী দ্বিতীয়ার্ধ হতে বিংশ শতাব্দী প্রথম ভাগ সমগ্র বাঙালীদের নব জাগরণের বা রেনেসাঁর যুগ হিসাবে অভিহিত করা হয়। এই সময়ে বাঙালীগণ জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মপ্রত্যয় এবং আত্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় দিক সম্বন্ধে সজাগ হয়ে উঠে। তারা জানতে উৎসুক হয়ে উঠে যে তাদের জাতিগত ঐতিহ্য সম্বন্ধে, ভাষাগত শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধে এবং ধর্মীয় প্রভাব প্রতিপত্তি সম্বন্ধে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন বাঙালীর ইতিহাস চাই, রাখাল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বাঙালীর ইতহাসে অনুসন্ধানের জন্য স্থাপত্য ভাস্কর্যের তত্ত্ব এবং প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করে বাঙালীর জাতীয় নিদর্শন উদ্ধার করে বাঙালীর ইতহাস রচনার ব্যাপৃত হন। বাঙালীগণ ভাষায় ইতিহাস উদ্ধার করার জন্য নেপাল, তিব্বত, চীন দেশে বাঙালীদের যাতায়াত শুরু করেন। বাংলার ধর্মীয় ইতিহাস সম্বন্ধে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পাল রাজাদের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস এসে পড়েছে। চরিত্রগত ভাবে একান্ত মনোযোগী বাঙালীরা বৌদ্ধ ধর্ম উদ্ধার জন্য তাদের নিয়োগ করতে গিয়ে পাল রাজাদের আমলে তন্ত্রমন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ দেখে নিজেদের অপরাধ বোধ অনুভব করতে লাগলেন। তারপর তারা বৌদ্ধ ধর্মের প্রাচীন গ্রন্থাবলী সন্ধান করতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষা

রচিত গ্রন্থাবলী তাদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক সন্তোষ্টির কারণ হলেও প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্মের স্বাদ গ্রহ করতে পারে নাই। এখানে সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক আলোচকদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) Sankrit Buddhist litsature of Nepal (1882) এবং An introduction of the Lalitavistar লিখে এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে প্রকাশ করেন। শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) নেপাল হতে বৌদ্ধ ধর্মীয় বিষয়ক তথ্য উদ্ধার করতে গিয়ে বাংলাভাষায় সিদ্ধাচার্যদের প্রাথমিক বাংলা স্বরূপ আবিস্কার করেন। শ্রীযুত বাবু শরৎচন্দ্র দাশ (১৮৩৯-১৯১৭) নেপাল ও তিব্বতে "বোধিসত্তাবদান কল্পকথা" বই বাংলায় অনুবাদ করেন এবং চৈনিক পরিব্রাজককে বিরচিত বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর সন্ধান পান। তিনি চট্টগ্রামে পন্ডিত বিহারের অস্থিত্ব সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া দ্বীজেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩), সতীশ চন্দ্র বিদ্যা ভূষণ (১৮৭০-১৯২০) শরৎ কুমার রায় (১৮৭৮-১৯৩৫) যোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার (১৮৮৩-১৯১৭), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রমুখ লেখকগণ সংস্কৃতি ভাষা হতে বৌদ্ধধর্মে মহাযান গ্রন্থে অশ্বঘোষের "বুদ্ধ রচিত" শান্তি দেবের "বোধিচর্চা অবতার", সৌন্দরানন্দ প্রভৃতি গ্রন্থের নাম উল্লেখযোগ্য। এদিকে শ্রীযুত বাবু কেশব চন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্ম্যসমাজ প্রতিষ্ঠাকালে ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে স্বতন্ত্র ধারায় বাংলা ধর্মীয় চেতনা প্লাবিত করেছিলেন। তিনি প্রত্যেক ধর্মীয় বিষয় সম্বন্ধে অবগত হয়ে জন সাধারণের ধর্মীয় অনুভূতিতে সমভাব প্রবর্তনের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের ধর্ম শিক্ষায় জন্য নিয়োগ করেছিলেন। যতা- (১) উপাধ্যায় গৌড় প্রসাদ রায় - সংস্কৃতি ভাষা

(২) ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার- বাইবেল গন্থ

(৩) মৌলভী গিরিশ চন্দ্র সেন - কোরআন

(৪) সাধু অঘোর নাথ গুপ্ত- পালি।

সাধু অঘোর নাথ গুপ্তকে বৌদ্ধ ধর্মে বিষয়ক শিক্ষার জন্য শ্রীলংকায় পাঠানো হয়। তিনি শ্রীলংকায় তিন বৎসর অবস্থান করে স্থবিরবাদী বৌদ্ধ ধর্মীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। সাধু অঘোর নাথ গুপ্ত শাক্যমুনি চরিত (১৮৮২) নির্বাণতত্ত্ব (১৮৮৩) ছমান তদনুগ বন্ধ (বুদ্ধ চরিত ও বৌদ্ধ ধর্মীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ- ১৮৮৩) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এতদসত্বে বাঙালী সমাজ বৌদ্ধ সম্বন্ধে প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন নাই। কারণ বৌদ্ধ ধর্মের মগধী বা পালির স্বতন্ত্র স্বাদ তাই Neuman মধ্যম নিকায় অনুবাদের ভূমিকায় একস্থানে লিখেছেন- One who knows Pali need no light from outside".

এদিকে বৌদ্ধ ধর্মের বিষয়ের জনসাধরণের প্রবল আগ্রহ দেখে কিছু কিছু হিন্দু দার্শনিক ও পন্ডিত পুনরায় বৌদ্ধ ধর্মকে হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে বিশেষভাবে লেগে যান। এখানে পন্ডিত রাহুল সাংক্যয়ন কর্তৃক রচিত "দর্শন দিগ্‌দর্শন" গ্রন্থে Indian Philosophy by Sir S. Rudha Khrinshna সমালোচনার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। "অনিত্য-দুঃখ, অনাত্ম" সম্বন্ধে বুদ্ধের দ্বারা ঘোষিত হবার পরও যদি স্যার রাধা কৃষ্ণদের ন্যায় হিন্দু দার্শনিক পন্ডিত অনধিকার চর্চা করে নিম্নোক্ত মন্তব্য করতে পারেন তবে তাঁকে ধর্মকীর্তির ভাষায় বলত হয়, "ধিক ব্যাপকতমঃ" এখানে রাহু সাংকৃত্যায়ন স্যার রাধা কৃষ্ণেনের চারটা মতবাদ খন্ডন করেছেন-

(১) বুদ্ধ ধ্যান ও প্রার্থনার অবলম্বন করেছেন।

(২) বুদ্ধের মত ছিল যে, কেবল বিজ্ঞানই ক্ষনিক অন্য পদার্থ নেই।

(৩) আত্মার সম্বন্ধে বুদ্ধের নীরব থাকার অপর কারণ আছে।

(৪) বুদ্ধ উপনিষদে বর্ণিত আত্মার সম্বন্ধে নীরব ছিলেন। তিনি উহাকে স্বীকার ও করেন নাই, অস্বীকারও করেন নাই।

স্যার রাধা কৃষ্ণনের উপরি উক্ত মতগুলি রাহুল সাংকৃত্যায়ন বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে খন্ডন করেছেন। স্যার রাধাকৃষ্ণনের লিখিত Prof. P.v. Bapat এর 2500 Years of Buddhism এর Forward এ বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক বক্তব্যে ডাঃ গুণপাল পিয়সেন মলাসাশেখর নেপালের ১৬ই নভেম্বর ১৯৫৬ অনুষ্ঠিত বৌদ্ধ সম্মেলনে অভিযোগ করেছেন। তিনি লিখেছেন-

I would also draw your attention to the excellent volume "2500 years of Buddhism" edited by our old friend and colleague Dr. P.V. Bapat and Published by Government of India. I must confess however us that I am disappoaented in severel stitements contained in the Forward to that book by. Sarvapali, Rad ha Khrishnan. He syas eg. The Buddha did not feel that he was anouncing a new religion. He was born, grew and died a Hindu. that at least is but a half truth. And again a Buddhism did not start as a new and independent religion. It was an off-shoot of the more ancient faith of the Hindus, perhaps a schsm or an heresy". Note the perhaps these unjustificable proclamators not with standing to the literatue on Buddhism."

বাংলাদেশে স্থবিরবাদ বিকাশে শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবিরের অবদান

চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের বাঙালী বৌদ্ধদের মধ্যে প্রথম সংঘরাজ শ্রীমৎ সারমেধ মহাস্থবির (১৮০১-১৮৮২) কর্তৃক স্থবিরবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির (১৯০০-১৯৯৯) অষ্টম সংঘরাজ। স্থবিরবাদ বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্রতা ও বিশুদ্ধিতা সংরক্ষণের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ভিক্ষুসঙ্ঘের গুরুশিষ্য পরম্পরা ধারাবাহিকতা। এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সংঘরাজ নিকায় স্থবিরবাদের শিষ্য পরম্পরা রক্ষা করে আসতেছেন। সঙ্ঘরাজ নিকায়ের সঙ্ঘরাজ দের মধ্যে শ্রীমৎ সারমেধ মহাস্থবির - ১৮৬৪-১৮৭৭ পর্যন্ত ১৩ বৎসর শ্রীমৎ পূর্ণাচার মহাস্থবির ১৮৭৭-১৯০৯ পর্যন্ত ৩২ বৎসর, শ্রীমৎ জ্ঞানালংকার মহাস্থবির-১৯০৯-১৯২৭ পর্যন্ত ১৯ বৎসর শ্রীমৎ বরজ্ঞান মহাস্থবির ১৯২৭-১৯৩৬ পর্যন্ত ৯ বৎসর শ্রীমৎ তেজবন্ত মহাস্থবির, ১৯৩৬-১৯৪২ পর্যন্ত ৬ বৎসর, শ্রীমৎ ধর্মানন্দ মহাস্থবির ১৯৪২-১৯৫৭ পর্যন্ত ১৫ বৎসর, শ্রীমৎ অভয়তিষ্য মহাস্থবির ১৯৫৭-১৯৭৪ পর্যন্ত ১৭ বৎসর এবং শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির ১৯৭৪-১৯৯৯ পর্যন্ত ২৫ বৎসর স্থবিরবাদ ভিক্ষুসঙ্ঘের সঙ্ঘরাজ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই স্থবিরবাদী ভিক্ষু সঙ্ঘের থের পরম্পরা ইতিহাস আমরা বিভিন্ন সূত্রে জানতে পারি। ভগবান বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে সারিপুত্র মোগ্গলায়ন, মহাকাশ্যপ, অনুরুদ্ধ, মহাকাচ্চায়ন, উপালী, আনন্দ প্রভৃতি স্থবিরগণের প্রজ্ঞায় এবং দূরদৃষ্টির প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্মের স্থবিরবাদ এখনও স্বমহিমায় দেদীপ্যমান এই স্থবিরদের জীবন বৃত্তান্ত পর্যালোচনা কলে আমরা দেখতে পাই যে তারা তাঁদের পূর্ববর্তী বুদ্ধদের নিকট অগ্রশ্রাবক মহা শ্রাবক হওয়ার বর প্রাপ্ত হয়ে কেহ প্রজ্ঞায় কেহ ঋদ্ধিতে, কেহ সমাধিতে, কেহ ধর্ম বাচন ভঙ্গিতে, কেহ ধুতাঙ্গ সংরক্ষণে কেহ বিনয়ে এবং কেহ ধর্ম ধারণে স্ব স্ব ভূমিকায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলে ভগবান বুদ্ধ উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধের ধর্ম ধারণে এবং সংরক্ষণে শ্রাবক মহাশ্রাবকদের ভূমিকা বুদ্ধ ধর্ম বিনয়ের বিশুদ্ধিতা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। সম্যক সম্বুদ্ধ ব্যতীত এই শ্রাবক মহাশ্রাবকদের আবির্ভাব সম্ভব নহে। অহো! কি অপরিসীম বুদ্ধ মহিমা।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর মহাকাশ্যপ প্রথম সঙগীতিতে বুদ্ধের ধর্মাবিনয় সুশৃঙ্খলভাবে সুবিন্যস্ত করেছিলেন। এই সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ধর্মবিনয় থের পরম্পর বিনয়ধর ধর্মধীর শ্রুতিধর এবং স্মৃতিধর ভিক্ষুগণ সংরক্ষণ করে আসতেছিলেন। আমরা এখানে থের পরম্পরা স্থবিরবাদ ভিক্ষুদের ক্রমিক ঐতিহাসিক তথ্য উত্থাপন করতেছি। ভগবান বুদ্ধের সাক্ষাৎ শিষ্যদের উপালি স্থবিরকে বিনয়ধর বলা হয়। প্রথম সংগীতি তিনি বিনয়ের বিষয়ে প্রশ্নোত্তরে বিনয় সংগায়ন করেন। উপালী স্থবিরের শিষ্য হলেন দাসক স্থবির, তাঁর শিষ্য সোনক স্থবির, তাঁর শিষ্য সিগ্গর স্থবির ও চন্ডবজ্জী এবং তাদের শিষ্য ছিলেন তৃতীয় সংগীতির নায়ক মোগ্গলীপুত্র তিষ্য, মোগ্গলীপুত্র তিষ্য মহাস্থবির ভবিষ্যতে বৌদ্ধধর্মের সুপ্রতিষ্ঠাকালে প্রত্যন্ত প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে নয় স্থানে ধর্মদূত প্রেরণ করেছিলেন। তাদের মধ্যে মজঝান্তিক স্থবিরকে কাশ্মীর-গান্ধার রাজ্যে, মহারেবত স্থবিরকে মহিংসক মন্ডলে, মহাধর্ম রক্ষিত স্থবিরকে মহারাষ্ট্রে, মজঝিম স্থবিরকে হিমবন্ত প্রদেশে, যোনক রক্ষিত স্থবিরকে বনবাসী রাজ্যে, ধর্ম রক্ষিত স্থবিরকে অপরান্ত প্রদেশে, মহারক্ষিত স্থবিরকে যোনক রাজ্যে, সোন ও উত্তর স্থবিরদ্বয়কে সুবর্ণভূমিতে এবং মহিন্দ স্থবিরকে তম্বপনীদ্বীপে অর্থাৎ

শ্রীলংকায় ধর্ম প্রচারার্থে প্রেরিত হয়েছিল। শাসনবংশ গ্রন্থ হতে শ্রীলংকায় স্থবির পরম্পরা ভিক্ষুদের নাম উদ্ধৃতি নেয়া হল। মহামহিন্দ স্থবির শিষ্য অঁরিটঠ - স্থবির তাঁর শিষ্য তিসস দত্ত - কাল সুমন, দীর্ঘ - দীর্ঘ সুমন - নাগ - বুদ্ধ রক্ষিত - সুমন ..... চুল নাগ - ধর্ম পালিত - ক্ষেম - উপতিস্স - ফুস্সদেব - সুমন - মহাপদুম - মহাসিব- উপালী - মহানাগ - অভয় - তিস্স - সুমন - চুলাভয় - তিস্স ..... চুলদেব ও তার শিষ্যসব চতুর্থ সংগীতিকারক। ব্রহ্মদেশে সোন - উত্তর স্থবির শিষ্য ছিলেন সোভিত স্থবির, তার শিষ্য সোমদত্ত - সুমনতিস্স - সোভাগ - সোমদত্ত (২য়) - অনামোদস্সী - অধিশীল - পানদস্সী - মহাকাল - সীলবুদ্ধি - ধম্মদস্সী - (রাজা অনিরুদ্ধের সময় অরহন্ত স্থবির নামে পরিচিত) - গুণসার - অগ্গপন্ডিত স্থবির - অগ্গবংশ - উত্তরজীব - ছপপদ - সদ্ধম্মচিত্ত - তিস্সাধ্বজ - ধর্মরাজ গুরুস্থবির - মুনিন্দ ঘোষ - মহাতিস্স -চন্দপঞ্ঞ - গুনসিড়ি - ঞানিধ্বজ - ধম্ম ধর - ইন্দোভাস - কল্যানচক্ক - বিমলাচার - গুণসার - চন্দ্রসার - বরএসি - গুনসিরি (২য়) ঞানভি বংস - সুয়িব বংসালংকার - (ঞেয্য ধর্ম স্থবির (৫ম সংগীতির সভাপতি)

বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে বীর্যবান, স্মৃতিমান ও বিনয়ী ভিক্ষুর অভাবে এবং রাজাঞা ও ধর্মাঞার মধ্যে বিরোধের ফলে ভিক্ষুসঙ্ঘের বিপর্যয় পরিলক্ষিত হয়। দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ও নৈতিক অবক্ষয় ও ভিক্ষুসংঘের দুর্দশার কারণ। অনেক স্থানে মহাসাংঘিক ভিক্ষুদের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে প্রকৃত ধর্ম বিনয়ের সহিত অসদৃশ্য ধর্মের জন্য ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুপ্রতিপন্ন ঋজুপ্রতিপন্ন, ন্যায় প্রতিপন্ন ও সমীচী প্রতিপন্ন ভিক্ষুসঙ্ঘ গড়ে উঠে নাই। কিন্তু স্থবিরবাদী ভিক্ষুদের মধ্যে থেরপরম্পরা ভিক্ষু সংঘের বিশুদ্ধিতা সংরক্ষণের প্রতি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে ভিক্ষু সঙ্ঘের মধ্যে কোন বিপর্যয় দেখা দিলে তারা সংস্কার করা হয়েছে। শ্রীলংকায় দীর্ঘদিন বৌদ্ধধর্মের ধ্বজা আপন মহিমায় বিরাজমান থাকলেও মহাবিহারের ভিক্ষুদের সহিত অভয়গিরি বাসী মহাসাংঘিক ভিক্ষুদের মধ্যে সম্পর্ক ভাল ছিলনা। শ্রীলংকার -বোহার তিস্সনামক রাজার রাজত্বকালে মহাবিহারবাসী ভিক্ষুগণ মহাযানী ভিক্ষুদেরকে যথাযথভাবে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করে জিন শাসন সমৃদ্ধ করা হয়েছিল। ব্রহ্মদেশ, শ্রীলংকা এবং শ্যামদেশের ভিক্ষুদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ভিক্ষুসংঘের সংস্কার করা হয়েছিল। ১০৫৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে রাজা অনিরুদ্ধ ভদন্ত অরহতের সহায়তা থেরবাদ ভিক্ষুদের সংস্কার করেছিলেন। ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীলংকার রাজা বজিয় বসু আরকান থেকে ভিক্ষু আনায়ে সেখানে জিন শাসন পরিশুদ্ধ করেছিলেন। ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশীয় ভিক্ষু ছপ্পদ শ্রীলংকায় গিয়ে সোন ও উত্তর স্থবিরের শিষ্যদের ধর্মীয় বিধান মতে ভিক্ষত্ব পরিশুদ্ধ করে ভিক্ষুদের জন্য পুনঃ জাগরণ করেছিলেন। ব্রহ্মদেশের রাজা ধর্ম চেতিয় রাজত্বকালে (১৪৭২-৭৯) ব্রহ্মদেশের ২২ ভিক্ষু শ্রীলংকায় গিয়ে পুনঃ উপসম্পদা গ্রহণ করে পেগুতে সিংহলী ভিক্ষু সংঘ পতিষ্ঠিত করেছিলেন। রাজা কীর্তিশ্রী রাজা সিংহের সময় শ্রীলংকার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অভাব পরিলক্ষিত হলে ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে শ্রীলংকার শ্যাম দেশ হতে গিয়ে "শ্যামোপালী নিকায়" প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের তৎকালীন রাজধানী অমর পুরে হতে ভিক্ষু গিয়ে শ্রীলংকায় "অমর নিকায়" প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে রাজা মংকুট ভিক্ষু থাকাকালীন সময়ে মোন ভিক্ষু সহায়তায় তিনি শ্যামদেশে "ধর্মযুক্তি নিকায়" প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্যামদেশের ভিক্ষুরা নিজেদের মধ্যে শুদ্ধি অভিযান পরিচালনা করে 'মহানিকায়" নামক ভিক্ষু সঙ্ঘের স্মৃতি করেছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশের ভিক্ষু পুন্নাচার ধর্মধারী কয়েক জন ভিক্ষু শ্রীলংকায় গিয়ে "রামঞ্ঞ নিকায়" নামক শ্রীলংকায় তৃতীয় নিকায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এদিকে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দুর্দশায় দেখে শ্রদ্ধেয় সারমেধ মহাস্থবির বিনয় কর্মের উপযোগী সংখ্যক ভিক্ষু নিয়ে চট্টগ্রামে এসে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম থেরবাদী "সংঘরাজ নিকায়" প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

অষ্টম সংঘরাজ শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির স্থবিরবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একজন মূর্ত প্রতীক। তিনি শত বৎসর জীবিত থেকে এই নিকায়ে একজন আদর্শ ধারক ও বাহক ছিলেন। তার পূর্ব জন্মকৃত পুণ্য প্রভাবে তিনি "অক্ষন বিমুক্ত" সময়ে *"দুল্লভো মনুস্স পাঠ লাভো"*

দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করে পরম সেই ভাগ্যের অধিকারী হয়েছে। বুদ্ধ বলেছন– *"দুল্লভো খনসম্পত্তি।"* ক্ষণ সম্পত্তি অতিশয় দুর্লভ। এই অষ্ট অক্ষণ বিনিমুক্ত সময়ে অতি দুর্লভ। সেই অষ্ট সম্পত্তি সঠিক সুখদায়ক সুক্ষণ লাভ করে কোন জ্ঞানী ব্যক্তিই প্রমত্ত হবে। (ধর্মপদ)। অষ্ট অক্ষন বলতে নিম্নলিখিত সময় বুঝায় যথা (১) তয়ো অপায়া-নরক, প্রেত, ও পশুপক্ষীকূল– এই ত্রিবধ অপায় (২) পঞ্চেন্দ্রয়ানং বেকল্লং– চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, কায় ও মন– এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিকলতা (২) মিচ্চাদিট্ঠিচ দারুন– দারুন মিথ্যা দৃষ্টি (৪) অপাতু ভাবে বুদ্ধসম সদ্ধর্মামত দায়িনের-সদ্ধর্মামৃতদায়ক বুদ্ধের অনুৎপত্তিকাল। এই অষ্টম প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হলে সেই দুর্ভাগা কোন প্রকার কুশল কর্ম সাধন করতে পারে না। তাই এইসব অবস্থাকে অক্ষন বলে কথিত হয়।

"যং ভাবনামযং পুঞ্ঞঞ্চং সম্পত্তি সময়াবহং,
তস্সোকাসাভাবেন এতে অক্খন সম্মতা।

ভাবনায় লব্ধ পূণ্য এবং যথাসময়ে সত্য জ্ঞান লাভ– এই সব লাভের অবকাশ না থাকলে অক্ষন বলে কথিত হয়।

শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির অক্ষন বিমুক্ত সময়ে জন্ম গ্রহণ করে এই দুর্লভ মানব জন্ম আরও "দুল্লভ পব্বজ্জা অর্থাৎ দুর্লভ প্রব্রজ্যা গ্রহণ জিনশাসনের ধ্বজা সমুন্নত রক্ষা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন এবং জিন শাসনে অমর অবদান রাখতে সদ্ধর্ম হয়েছেন।

চট্টগ্রামের এক বৌদ্ধ পরিবারে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির জন্ম। তার পিতা শ্রী জয়ধন বড়ুয়া এবং মাতা শ্রীমতি শ্যামাবতী বড়ুয়া। সচ্ছল পরিবারে স্নেহমমতায় পরিপূর্ণতায় শৈশবকাল অতিবাহিত হয়েছিল। পূর্ব জন্মকৃত জন্ম প্রভাবে দুল্লভ বুদ্ধ্যোৎপত্তিকালে বৌদ্ধ পরিবারে জন্ম করে পারিবারিক সচ্ছলতার মধ্যে ও প্রব্রজ্যা করে কামাসব ও কাম-সুখ পরিত্যাগ করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তাই শৈশব হতে সাংসারিক উদাসীনতা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। কৈশোরে চট্টগ্রাম শহরে জে এম সেন স্কুলে ভর্তি হয়ে মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু সাধারণ লেখাপড়ার চাইতে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি তাঁর প্রবল টান ছিল। অল্প বয়সে আরকানে গিয়ে অগ্গমহাপন্ডিত শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের নিকট ধর্মীয় শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন। কিছু দিনের বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষায় প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বৌদ্ধ ধর্মের বিনয়ের সকল শর্তাধীনে ব্রহ্মদেশের পঞ্চম বৌদ্ধ সংগীতির ১৫ জন শীলবান ও অভিজ্ঞ মহাস্থবিরের উপস্থিতিতে ব্রহ্মদেশর সওজেদী বিহার সীমায় অধ্যক্ষ উ-তেজরাম মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ে শ্রীমৎ শীলালংকার উপসম্পদা প্রাপ্ত হয়ে "শ্রীমৎ শীলালংকার ভিক্ষু" নাম গ্রহণ করেছিলেন। উপসম্পদা কর্মের প্রত্যেক যোগাযোগে শ্রীমৎ শীলালংকার ভিক্ষুর অনুকূলে ছিল। তিনি তারপর রেঙ্গুণে গিয়ে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের নিকট কিছুদিন ধর্ম শিক্ষা করে চট্টগ্রামে চলে আসেন। শ্রীমৎ শীলালংকার ভিক্ষু চট্টগ্রামের মায়নী বৌদ্ধ বিহার প্রথম বর্ষাবাস যাপন করেন। প্রথম বর্ষাবাসের পর তিনি বিভিন্ন ধর্ম সভায় শ্রীমৎ প্রজ্ঞাতিষ্য , শ্রীমৎ জ্ঞানালংকার, শ্রীমৎ বঙ্গচন্দ্র, শ্রীমৎ আর্য বংশ প্রভৃতি ধর্ম বিনয়ে অভিজ্ঞ মহাস্থবিরদের নিকট বৌদ্ধ ধর্মের গভীর তত্ত্বকথা শুনে বৌদ্ধ ধর্ম আয়ত্ব করার জন্য বিশেষ ভাবে উদ্গ্রীব হয়ে পড়েন।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ শীলালংকার ভিক্ষু শ্রীমৎ ধর্মতিলক ভিক্ষু এবং শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু তিন জনে বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষার জন্য শ্রীলংকায় যাত্রা করেন। সেখানে তাঁরা পানাদুরে সদ্ধর্মোদয় পরিবেণে বদ্ধ সীমায় শ্রদ্ধেয় উপসেন মহাস্থবিরের নিকট দ্বিতীয়বার কর্মবাক্য পাঠ পুনঃ উপসম্পদা গ্রহণ করেন। এই বিহারে দুই বৎসর অবস্থান করে তারা ধর্ম বিনয় অধ্যয়ন করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁরা কেন্তির উভবত নামক স্থানে সদ্ধর্মাভানক নামক পরিবেণে শ্রদ্ধেয় পন্ডিত ধর্মদর্শী মহাস্থবিরের নিকট আরও দুই বছর বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যয়ন করেন। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে শ্রীমৎ শীলালংকার ভিক্ষু রেঙ্গুণে কান্দাগ্লে ধর্মদূরে বিহারে তার গুরু দেব শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের নিকট কিছুদিন অবস্থান করেন। তারপর তিনি চট্টগ্রামে নানুপুর বৌদ্ধ বিহারে দুই বৎসর বর্ষাবাস করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির তার গুরুর আহবানে কলকাতায় ধর্মাঙ্কুরে বৌদ্ধ বিহারে বিহারাধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। এই সময়েই তিনি বৌদ্ধ বিষয়ক পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৩

খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ শীলালংকার ভিক্ষু তার গুরুর নির্দেশে রেঙ্গুণে গিয়ে তার গুরু প্রতিষ্ঠিত এবং গুরু পরিচালিত বৌদ্ধ মেশিন প্রেসের কার্যভার গ্রহণ করেন, তখন তিনি বৌদ্ধ ধর্মীয় বিষয়ক মাসিক পত্রিকা "সংঘ শক্তি"র সম্পাদক হিসাব কার্যভার গ্রহণ করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক কয়েকটি পুস্তক রচনা বৌদ্ধ ধর্মের স্থবিরবাদের মগধী ভাষা সম্বন্ধে বাঙালীদিগের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দী শেথার্ধে বাঙালীদের নব জাগরণের যুগে বাঙালীর ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে বৌদ্ধ রাজার অবদান সম্বন্ধে এবং বৌদ্দ পন্ডিতদের বাংলা ভাষায় প্রাথমিক বচন সম্বন্ধে তথ্যাদি উদ্ধার করতে গিয়ে সংস্কৃত ভাষায় প্রাপ্ত বিবরণই পাওয়া গিয়েছিল। সংস্কৃত ভাষা প্রাপ্ত বৌদ্ধ ধর্মীয় বিকৃত ধারণা বৌদ্ধ ধর্মের স্থবিরবাদের স্থান পাওয়া যায় না বলে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ঠাকুর পরিবারে যখন বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্দে জানবার জন্য কৌতুহলী হয়ে উঠে, তখন তারা বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত স্বাদ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে। রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর লিখেছেন বৌদ্ধ ধর্ম জানবার জন্য তথা মগধী ভাষা অনুদিত মাত্র দুইটা বইয়ের সন্ধান পেয়েছেন। একটা বই হল শ্রী ধর্মরাজ বড়ুয়া লিখিত হস্তাসার" গ্রন্থ এবং আরেকটা হীল শ্রীমৎ শীলালংকার ভিক্ষু লিখিত "ধর্মপদ অট্‌ঠকথা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম জীবনে একাদশ শতাব্দীর কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র রচিত "বোধিসত্ত্বাবদান কল্পকথা" হতে ৮টা গীতি নাট্য রচনা করেছিলেন। পরে তিনি পালি সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনি ধর্মপদের যমকবর্গের কয়েকটি গাথা ও পদ্যাকারে অনুবাদ করেছিলেন। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন বাংলাদেশে পাঁচ ব্যক্তিটি নেই যারা পালি সম্বন্ধে আলোচনা গবেষণা করতে পারেন। ঈশান চন্দ্র ঘোষ (১৮৬১-১৯৩৫) রচিত জাতক অর্থকথার বঙ্গানুবাদ দেখে তিনি ঈশান চন্দ্র ঘোষর ভূয়শী প্রশংসা করেছিলেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির চট্টগ্রামে এসে ৬ বৎসর নানুপুর ১৫ বৎসর বৈদ্যপাড়া এবং ২২ বৎসর মির্জাপুর শান্তিধাম বৌদ্ধ বিহারে অবস্থান করেন। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় পুস্তকাদি রচনা করে 'সাহিত্যরত্ন" অভিধায় অভিক্তি হয়েছিলেন। ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে তিনি শ্রদ্ধেয় অভয়তিষ্য মহাস্থবির মৃত্যুর পর বাংলাদেশের বৌদ্ধদের স্থবিরবাদের সংঘরাজ নিকায়ে সংঘরাজ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বৌদ্ধপ্রধান দেশ থাইল্যান্ডে সর্বপ্রথম পরিভ্রমণের সময় রাজকীয় মর্যাদা পেয়েছিলেন। তারপর ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে সংঘরাজ হিসাবে থাইল্যাণ্ডে বাংলাদেশের ২১ জন প্রতিনিধির পরিচালক হিসাবে পুনঃবার রাজকীয় মর্যাদা পেয়েছিলেন। ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মঙ্গোলিয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন অধ্যুষিত এশিয়া বৌদ্ধ শান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি জাপানের রাজধানী টোকিওতে অনুষ্ঠিত সাধারণ ও পরমানবিক নিরস্ত্রীকরণের জন্য বিশ্ব ধর্মীয় সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মায়ানমার সরকারের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়ে বর্তমান বৌদ্ধ জগতে বর্ষীয়ান সংঘরাজ হিসাবে অভূতপূর্ণ সম্মান লাভ করেন। এইভাবে তিনি শ্রীলংকা, মায়ানমার, থাইল্যাণ্ড, ভারত রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ সফর করে বাংলাদেশের সাথে বহির্বিশ্বের মধ্যে স্থবিরবাদ বৌদ্ধদের আদর্শ পূর্ণ মর্যাদায় সংরক্ষণ করে গেছেন। সংঘরাজ শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবিরের অকৃত্রিম অবদানের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রধান দেশ মায়ানমার সরকার তাঁকে "অগ্‌গমহাসদ্ধর্ম-জ্যোতিকাধ্বজ" রাষ্ট্রীয় উপাধি প্রদান করেন। শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবিরের রচিত বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থাবলী স্থবিরবাদের মূলভাষা হতে অনুদিত হওয়ায় বাংলাদেশে স্থবিরবাদ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার হেতু হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তার রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা-

(১) রাহুল চারিত- বৌদ্ধ মিশন প্রেস- ১৯৩০
(২) অজাত শত্রু- বৌদ্ধ মিশন প্রেস- ১৯৩৪
(৩) ধর্মপদ অট্‌ঠকথা- বৌদ্ধ মিশন প্রেস- ১৯৩৪
(৪) বিমান বত্থু- ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী- ১৩৯৭ বাংলা
(৫) বুদ্ধ যুগে নারী - ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থা প্রকাশনী-১৩৯৭ বাংলা
(৬) বিশাখা- ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থা প্রকাশনী-১৩৯৭ বাংলা
(৭) জীবক- ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থা প্রকাশনী-১৩৯৭ বাংলা
(৮) বৌদ্ধ নীতি মঞ্জরী - ত্রিপিটক গ্রন্থ প্রকাশনী-
(৯) আনন্দ- ত্রিপিটক গ্রন্থ প্রকাশনী
(১০) জাতক মালা- ত্রিপিটক গ্রন্থ প্রকাশনী

সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ

১। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ– শ্রী বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি, চট্টগ্রাম- ১৯৪৩

২। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ- সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া- কলকাতা ১৯৯১

৩। চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের ইতিহাস– ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম-১৯৮১

৪। দীর্ঘ নিকায়– ভিক্ষু শীলভদ্র কলকাতা- ১৯৯৭

৫। দুই হাজার সালে বৌদ্ধ ধর্ম– ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম। ১৯৯১

৬। দর্শন দিগ দর্শন– রাহুল সাংকৃতায়ন অনুবাদ ছন্দা ছট্টোপাধ্যায়, কলকাতা– ১৯৮৮

৭। বড়ুয়া জাতি– শ্রী উমেশ চন্দ্র মুৎসুদ্দী, চট্টগ্রাম– ১৯৫৯

৮। বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম – শ্রী নলিনী নাথ দাশগুপ্ত– কলকাতা- ১৩৫৫ বাংলা

৯। বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ– ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, কলকাতা- ১৯৩৬

১০। বৌদ্ধ পরিনয় পদ্ধতি– ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, কলকাতা– ১৯২১

১১। বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস– ডঃ মনিকুন্তলা হালদার (৫) কলকাতা, ১৯৬৬

১২। মহা পরিনির্বাণ সুত্তং– রাজগুরু শ্রীধর্মরত্ন মহাস্থবির, চট্টগ্রাম– ১৯৪১

১৩। মহাবর্গ– প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, কলকাতা– ১৯৩৭

১৪। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন– ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী, চট্টগ্রাম- ১৯৭৮

১৫। শাসনবংশ– শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, কলকাতা– ১৯৬২

১৬। শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির– ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম- ১৯৯৩

১৭। সদ্ধর্ম রত্নাকর- শ্রী ধর্ম তিলক স্থবির, রেঙ্গুন– ১৯৩৬

১৮। সদ্ধর্ম রত্নচৈত্য- জিনবংশ মহাস্থবির, চট্টগ্রাম।- ১৯৪৭

১৯। শাক্যমুনি চরিত ও নিবাণতত্ত্ব– অঘোরনাথ গুপ্ত, কলকাতা- ১৯৯২

Bibliography:

1. A Survey of Buddhism- Bhikshu Sangharaskit Bangalore-1972
2. An Handbook of Pali Literature- De Gruyter Berlin-1996
3. Bhiksuni Vihaya- Gustav Roth Patna-1920
4. Buddhism in Bangladesh. Dr. Sitangshu Bikash Barua, Chittagong. 1990
5. Buddhism in Ancient Bangla Dr. Puspa Niyogi Cacutta- 1989.
6. Buddhist sects in India- Nalila ksha Dutta, Delhi- 1978
7. Buddhist Thought in India, Edward Conze. London- 1982
8. Early History of Buddhism in Ceylon- E.W. Adikaran. Colombo- 1946
9. History of Buddhism in Ceylon- Rev. WalpalaRahul, Colombo- 1966
10. Pali Language and Literature (Vol-1+II) Kanai Lal Hazara, New Delhi 1998
11. 2500 Years of Buddhism- Prof. P.V. Bapat. New Delhi 1976.

ডাঃ সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, এম বি বি এস; এফ সি পি এস, (সার্জারী) ৭ই মে, ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার রাউজান উপজেলার অন্তর্গত রাউজান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রয়াত নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়া রাউজান আর্য-মৈত্রেয় উচ্চ বিদ্যালয়ে দীর্ঘ দিন ধরে শিক্ষকতায় নিয়োজিত থেকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। তাঁর মাতার নাম নীলিমা বড়ুয়া। ডাঃ বড়ুয়া রাউজান আর্য-মৈত্রেয় প্রাইমারী ও উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে পালিতে কৃতিত্বের সহিত ম্যাট্রিকুলেশন এবং চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ হতে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে আই, এস, সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হতে ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে এম বি বি এস, পাশ করেন। ঢাকার পোষ্ট গ্রেজুয়েট ইনষ্টিটিউটে লেখাপড়া করে তিনি ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে "বাংলাদেশ কলেজ অফ ফিজিশিয়ান এবং সার্জন" এর ফেলো হন। ডাঃ বড়ুয়া শৈশব হতে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্য বিশেষ আগ্রহী। উল্লেখ্য তিনি ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সংস্কৃত ও পালি বোর্ড হতে পালিতে আদ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি একজন শৈল্য চিকিৎসক হয়ে এবং অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা গবেষণা করে যাচ্ছেন। বৌদ্ধদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তিনি নিবেদিত প্রাণ। এই পর্যন্ত তিনি "নিবারণ চন্দ্র বড়ুয়া পরিচিতি", "চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের ইতিহাস", "সরণং গচ্ছামি", "ডঃ বেণী মাধব বড়ুয়ার জীবন দর্শন", "দশ পারমী ও চরিয়া পিটক", "ধাতুকথা", (সানুবাদ), "দুই হাজার সালে বৌদ্ধধর্ম", "শ্রীমৎ বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির", "আর্য-মৈত্রেয় বুদ্ধ", বৌদ্ধ পারিবারিক আইন, বৌদ্ধ সাহিত্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা, প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেছেন। তাহাছাড়া তিনি রাউজানে ভিক্ষুসংঘ " আয়োজিত পরিবাস উপলক্ষে প্রকাশিত "পরিবাস" সম্পাদনা ও "সাসন সেবক সংঘ" নামক সংগঠনের পক্ষে "প্রাথমিক বৌদ্ধ ধর্মীয় শিক্ষা ও খুদ্দকপাঠ" গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। ডাঃ বড়ুয়ার প্রায় বিশটি মৌলিক, তথ্যভিত্তিক এবং বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ বিভিন্ন স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে।

'প্রকাশক'